শরৎ-পরিচয়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৪

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—১০. ৪. ৫৭

শৈশব-সুহৃৎ, হুগলীর দ্বিতীয় চিরপলাতক

শ্রীভূপতি মজুমদার

করকমলেষু

গালমোহন ও উপেন্দ্রনাথ (মহেন্দ্রনাথের পুত্র) এবং সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ (অঘোরনাথের পুত্র)।

শরৎ চন্দ্র শৈশবে তাঁহার পিতার মাতুলের গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তখন দেবানন্দপুরে মতিলালের নিজস্ব বাসভবন ছিল না। পরে মতিলাল চাকুরী করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে তাঁহার মাতুলগণ তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন আন্দাজ চারি কাঠা মোকররী মৌরসী বাগানজমি বসবাসের জন্য দেন এবং সেই স্থানে দক্ষিণদ্বারী একতলা একহারা দুই কুঠরী পাকা ঘর মায় রোয়াক ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন।"*

বিদ্যাশিক্ষা

মতিলাল ছিলেন সদানন্দ অথচ অস্থিরচিত্ত পুরুষ, এবং উপার্জনে কবারে উদাসীন। একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ চন্দ্রও শবে লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধুলাতেই অধিকতর মনোযোগী লেন। বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তাঁহার মন মাবদ্ধ থাকিত না, অধিকাংশ সময় তিনি সঙ্গী-সাথীদের লইয়া চ্ছন্দ করিয়া বেড়াইতেন। "দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার সহপাঠী মবয়স্ক যাঁহারা আছেন...তাঁহারা বলেন—বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন ও উদ্দাম প্রকৃতির; তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদেরই বাটীর র্ত্তী ৺প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে;

* শ্রীবামব্রজনাথ দত্ত মুন্সী : "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র"—'ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪।

একটি প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটি বসিত এবং এখানে অনেকগুলি 'পড়ুয়া' ছাত্রছাত্রী ছিল; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র 'কাশীনাথ' তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্ব্বিচারে সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত ৺সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য মাষ্টার মহাশয়ের বাঙ্লা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে প্রায় তিনি এক বৎসর কাল পড়েন; এই স্কুলেই যখন তিনি বোধোদয় ও পদ্যপাঠ পড়িতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ দশ [আট ?] বৎসরের অধিক নহে এই সময়ে তাঁহার পিতা বিহারে কোনও স্থানে একটি চাকুরী পান…।

মতিলাল ডিহরীতে চাকুরি পাইয়াছিলেন। ডিহরীতে বাং শরৎ চন্দ্রের দিনগুলি খেলাধূলায় বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল; তাঁহ একখানি পত্রে ইহার আভাস আছে; তিনি লিখিতেছেন—

> ডিহরীতে যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয় নি তখ· আমি ওই ডিহরীর ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরণী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর ফাঁস করে গিরগিটি ধরতাম। উঃ ‹ কত কালের কথা? তখন রেল হয় নি ছোট ষ্টিমারে চ'ড়ে ‹ থেকে যেতে হোতো।†

---

* "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র": 'ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪।

† 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী,' পৃ. ৮২। এই প্রসঙ্গে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে শোণে ডিহরীর কথা স্মর্তব্য।

ডিহরীতে মতিলালের চাকুরি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৮৮৬ সনে তিনি সপরিবারে শ্বশুরালয় ভাগলপুরে ফিরিয়া আসেন। মাতুলালয়ে ফিরিয়া শরৎ চন্দ্র স্থানীয় দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলে ভর্তি হন; এখান হইতে তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় জিলা-স্কুলে সেকালের ৭ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

ইহার বছর দুই পরেই তাঁহার পিতা সপরিবারে পুনরায় দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে বারংবার স্থান-পরিবর্তনে বিদ্যার্জনে ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল বটে, কিন্তু বালক শরৎ চন্দ্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। দেবানন্দপুরে শরৎ চন্দ্রের কিছু দিন কাটিল— খেলাধুলায় মাতিয়া আর যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় দেখিয়া। শেষে তাঁহাকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। দেবানন্দপুর হইতে রোজ পায়ে হাঁটিয়া হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে গিয়া শরৎ চন্দ্র বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।* তাঁহার সহপাঠী হুগলী-নিবাসী হৃষীকেশ মজুমদার জানাইয়াছেন, শরৎ চন্দ্র ১৮৯৩ সনে এবং ১৮৯৪ সনের প্রথমাংশে ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এই স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই পুনরায় শরৎ চন্দ্রকে মায়ের সঙ্গে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে যাইতে হইল। সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য শরৎ চন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী পুত্রকন্যাদের লইয়া মাঝে মাঝে ভাগলপুরে পিত্রালয়ে যাইতে বাধ্য হইতেন। শরৎ চন্দ্রের মাতুলেরা

---

* "পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাই।"—"জনৈক পল্লীবালক—স্যাড়ার ডায়েরি" : "বিলাসী" দ্রষ্টব্য।

সকলের প্রতি সমান স্নেহ-সেবাপরায়ণা তাঁহাদের মেজদিদিকে পরম আদর-যত্ন করিতেন।

ভাগলপুরে পৌছিয়া শরৎ চন্দ্র ১৮৯৪ সনেই টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে যোগদান করেন এবং পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বয়স তখন ১৮, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষাদানকালে ১৫ বৎসর ৩ মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে শরৎ চন্দ্রের একজন শিক্ষক ছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শরৎ চন্দ্র এফ. এ. পড়িবার জন্য টি. এন. জুবিলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই বৎসরই তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয় (নবেম্বর ১৮৯৫)। পর-বৎসর টেস্ট পরীক্ষাদানকালে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষ শরৎ চন্দ্রকে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নাই। ১৫৲ টাকা ফী সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নাই—এ কাহিনী ভিত্তিহীন। শরৎ চন্দ্র লেখাপড়া অপেক্ষা বেশী মাতিয়া উঠিয়াছিলেন আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায়। তাঁহার তদানীন্তন প্রতিবেশী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

> ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় যখন শরৎচন্দ্রের পিতা তাঁহার তিন পুত্র এবং এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন তখন আমরা ছিলাম তাঁহাদের প্রতিবেশী। আমার অগ্রজ ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা। শরৎচন্দ্র তখন সম্পূর্ণভাবে বেকার এবং

সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু। সতীশচন্দ্র সঙ্গীত, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি 'আদমপুর ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটি ড্রামাটিক সেক্শন ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে বাংলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। 'মৃণালিনী,' 'বিল্বমঙ্গল,' 'জনা' নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি, ও জনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়-সুখ্যাতি বর্দ্ধিত করেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের অরিজিন্যাল বলিয়া যে রাজুর [রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের] উল্লেখ করা হয়, তিনি উপরোক্ত মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গল অভিনয়ে গিরিজায়া ও পাগলিনীর অংশ অভিনয় করেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে বিল্বমঙ্গল অভিনয় হইবার রাত্রি হইতে রাজু নিরুদ্দেশ এবং এই পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ("শরৎচন্দ্রের বাল্যকাহিনী" : 'বাতায়ন,' শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৪)

সাহিত্য-জীবনের প্রথম অধ্যায়

প্রচলিত ধারণা, ভাগলপুরেই শরৎ চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। প্রকৃতপক্ষে যৌবনের প্রারম্ভে—ষোল-সতের বৎসর বয়সে দেবানন্দপুরে পঠদ্দশাকালেই কথাসাহিত্য-রচনায় শরৎ চন্দ্রের হাতে-খড়ি হয়।

দেবানন্দপুরের গ্রাম্য পরিবেশ এবং মানুষই তাঁহার অন্তরে প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল।

শরৎ চন্দ্রের কোন কোন গল্প-উপন্যাসের সূচনা দেবানন্দপুরেই; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কাশীনাথে'র* উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'কোরেল গ্রাম' (পরে পরিবর্তিত আকারে 'ছবি') সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে; ইহার আরম্ভকাল—২৯ আগস্ট ১৮৯৩; সমাপ্তিকাল—৩ আগস্ট ১৯০০—পাণ্ডুলিপিতে† এই তারিখ দেখিয়াছি।

গল্পরচনার শক্তি ছিল শরৎ চন্দ্রের সহজাত। ছেলেবেলা হইতেই তিনি মুখে মুখে গল্প বলিয়া শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। স্বগ্রামবাসী জনৈক সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তির আনুকূল্যে সেই অল্প বয়সেই কথাসাহিত্য-রচনায় কি ভাবে তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, সে কাহিনী বড়ই চিত্তাকর্ষক। এই প্রসঙ্গে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখিয়াছেন—

> গ্রামের জমিদার নবগোপাল দত্ত মুন্সী মহাশয়ের এক পুত্র রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্র‡ তখন হুগলী কলেজে বি. এ. পড়িতেন।

---

* "শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু দুই জন বলিলেন যে যখন শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখনই তিনি 'কাশীনাথ' ও 'কাক-বাসা' নামক দুইটি গল্পের আখ্যানভাগ (plot) লিখিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন।...তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে 'কাশীনাথ' গল্পের নায়কের নাম তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই তাঁহাদের পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের নামানুযায়ী রাখা হয়।" ("দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র": 'ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪)

† শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ইহা সযত্নে রক্ষিত আছে।

‡ অতুলচন্দ্র দত্ত বয়সে শরৎচন্দ্র অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় ছিলেন। তিনি ১৮৮৮-৯০ সনে হুগলী কলেজে পড়েন; ১৮৯০ সনে হুগলী কলেজ হইতে বি-এ, ১৮৯১ সনে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন হইতে এম-এ, এবং ১৮৯২ সনে সিটি কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্র° *Hooghly College Register*, 1836-1936, p. 62.

…শরৎচন্দ্রের এই বয়সে গল্প বলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এবং এ জন্যই অতুলচন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বি. এ. পাস করার পর যখন কলিকাতায় এম. এ. ও আইন পড়েন, তখন মধ্যে মধ্যে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিতেন ও শরৎচন্দ্রের যাত্রা ও থিয়েটার দেখার আগ্রহ ছিল বলিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় থিয়েটার দেখাইয়া দেশে পাঠাইতেন। যাওয়ার সময় বিশেষভাবে বলিয়া দিতেন যে, তিনি অভিনয়ের বিষয়টি যেন গল্পে লিখিয়া রাখেন। ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে পুরস্কার দিতেন। এই ভাবেই ছেলেবেলা হইতেই শরৎচন্দ্রের গল্প লেখার উৎসাহ বাড়িতে থাকে। ('আনন্দবাজার পত্রিকা,' ১ মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ২২)

শরৎ চন্দ্রের কৈশোরের কিছুকাল ও প্রথম যৌবন প্রধানতঃ ভাগলপুরে মাতুলালয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। দেবানন্দপুরে সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত হইলেও, ভাগলপুরকেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূতিকাগার বলা যাইতে পারে। জন্মপল্লীতে সাহিত্য-প্রতিভার যে বীজ তাঁহার তরুণ হৃদয়ে উপ্ত হয়, ভাগলপুরে অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া তাহাই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগলপুরে শরৎ চন্দ্র ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্রতী হন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য।* ১৮৯৪ সনে, শরৎ চন্দ্রের আঠারো

* প্রমথনাথের আদি নিবাস কাল্‌নায়। তাঁহার কাকা ছিলেন মজঃফরপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। প্রমথনাথ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া ১৮৯৬ সনে (বয়স "১৫ বৎসর, ১১ মাস") মজঃফরপুর মুখার্জীস্‌ সেমিনারী হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ওয়

বছর বয়সের সময় মজঃফরপুরে প্রমথনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ইহাদের উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল—শরৎ চন্দ্রের জীবনের অনেক নিগূঢ় গোপন কথা প্রমথনাথের জানা ছিল। কিন্তু প্রমথনাথ শুধু শরৎ চন্দ্রের অন্তরতম সুহৃদ্‌ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁহার প্রাথমিক রচনাবলীর একজন শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা। উভয়ের মধ্যে কিরূপ অন্তরঙ্গতা ছিল এবং প্রমথনাথের সাহিত্য-বিষয়ক মতামতের উপর শরৎ চন্দ্র কতটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন তাহা প্রমথনাথকে লিখিত তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়—

তুমি ফণীর উপরে রাগ কোরো না।…সে কি ক'রে জানবে তুমি আমি কি, এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ।…তোমার

বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ সনে তিনি সিটি কলেজ হইতে ৩য় বিভাগে এফ. এ. পাস করিয়া মেট্রোপলিটানের থার্ড ইয়ার ক্লাসে ভর্তি হন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও ঠিক এই বৎসর (ইং ১৮৯৮, বয়স "১৭ বৎসর, ৩ মাস") মেট্রোপলিটান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে যোগদান করেন। কলেজের নাট্যাভিনয় লইয়া উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সঞ্চার হয়। কয়েক মাস পরে—বি. এ. পরীক্ষা দিবার পূর্বেই প্রমথনাথ কলেজ ত্যাগ করিয়া পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটরির পদ লাভ করেন। নাটক ও নাট্যাভিনয়ে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল; তিনি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'ক্লিওপেট্রা'র (১৩২১) রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে Evening Clubএর সৃষ্টি হয়, প্রমথনাথ ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক। তাঁহারই অকুণ্ঠ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া হরিদাসবাবু 'ভারতবর্ষ' প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষে' শরৎ চন্দ্রের আবির্ভাব প্রমথনাথেরই প্রযত্নের ফলে সম্ভব হইয়াছিল। ১৯১৮ সনের প্রথম ভাগে প্রমথনাথ অকালে পরলোক গমন করেন। কথা-সাহিত্যিক শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ইঁহার পুত্র।

আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানে না প্রমথ! (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)

*　　*　　*

আমার 'কাশীনাথ'টা অতি ছেলেবেলেকার লেখা। যে সময়ে ওটা তোমারও ভাল লাগত (মনে আছে বোধ হয়—পাথুরেঘাটায়) আমারও ভাল লেগেছিল লিখেওছিলাম। (৪-৪-১৯১৩)

*　　*　　*

তুমি যতক্ষণ না আমার লেখা পড়, ততক্ষণ আমার লেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটা সম্ভবতঃ ছেলেবেলার অভ্যাস।··· 'পথ-নির্দ্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহু দিনের একটা গোপন কথা? (মে ১৯১৩)

*　　*　　*

আমি যে গল্প বানাতে পারি তার কতক নমুনা ছেলেবেলাতেও পেয়েছ। (৩-৫-১৯১৩)

*　　*　　*

আমি তোমাকে শুধু যে ভালবাসি তাহা নহে, শ্রদ্ধাও করি। অর্থাৎ মতামতের উচ্চ মূল্য দিই। (১২-৫-১৯১৩)

১৮৯৪ সনে শরৎ চন্দ্রকে ("বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই") কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বাল্যসঙ্গীরা ভাগলপুরে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।* শরৎ চন্দ্র ছিলেন এই সভার সভাপতি।

---

* ভাগলপুরের সাহিত্য-সভা সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী-লিখিত "পুরাতন কথার আলোচনা" ('জয়শ্রী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) ও "আমাদের শরৎদাদা" এবং বিভূতিভূষণ ভট্টের "আমার শরৎদা" পঠিতব্য। শেষোক্ত প্রবন্ধ দুইটি ১৩৪৪ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে।

গুরুজনদের রক্তচক্ষু এড়াইয়া কোন নির্জন স্থানে, মাঠে বা গাছতলায় মাঝে মাঝে সভার আয়োজন হইত। এই সাহিত্য-সভা সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্র তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—

ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।...স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সব-জজ। তার পরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানা-শুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশী যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।

সম্ভবতঃ এই সময়েই...শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি,...সপ্তাহে এক দিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চ্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে...কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সবচেয়ে ভাল, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার 'পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত

এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার [হস্তলিখিত] মাসিক পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত।...

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন... বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশী, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমঝদার সমালোচকও তেমনি।

ভট্ট-পরিবারের সহিত শরৎ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ১৯০০ সনের কথা। বেকার শরৎ চন্দ্র তখন বিভূতিভূষণ ওরফে "পুঁটু"দের বাড়িতে বসিয়া একাগ্রচিত্তে নানা পুস্তক পাঠ করিয়া ও অজস্র লিখিয়া বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেছেন। এইখানেই একদিন কথা-সাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার স্মৃতিকথায় যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হইতে অধ্যয়নানুরাগী, তরুণ সাহিত্যস্রষ্টা শরৎ চন্দ্রের মূর্তিটি যেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তেমনি তাঁহার সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকের কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জানিতে পারা যায়। সৌরীন্দ্রমোহন বলিতেছেন—

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৺পূজার ছুটির পর কলকাতার কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ভাগলপুরে গেলুম মেসো মহাশয়ের কাছে। সেখানে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হলুম। কলেজে শৈশবের বন্ধু পুঁটুর সঙ্গে দেখা—সেও ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ছে।

১৯০০ সাল। জানুয়ারি মাস। কি একটা কারণে কলেজের ছুটি হয়ে গেল সকাল সকাল।...আমরা একটি দল গিয়ে উঠলুম পুঁটুর সঙ্গে তার গৃহে।...

পুঁটু আমায় দিল মোটা লাইন-টানা একখানি খাতা। সে খাতায় ছোট ছোট মুক্তার মতো অক্ষরে লেখা ছিল—'বাগান'। সেই 'বাগান'-খাতার পৃষ্ঠায় 'বোঝা,' 'কাশীনাথ,' 'অনুপমার প্রেম,' 'সুকুমারের বাল্যকথা' প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের লেখা কয়েকটি গল্প। মলাটের উপর লেখা ছিল আর্টিষ্টিক ছাঁদে ইংরাজী অক্ষরে লেখকের নাম—St. C. Lara অর্থাৎ St.=শরৎ ; C.=চন্দ্র ; এবং Lara অর্থ, শরৎচন্দ্রের ডাক-নাম 'ন্যাড়া'।* এই ত্রিধারাযোগে St. C. Lara সৃষ্টি। তখনও লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয় নি—তাঁকে চোখেও দেখি নি।

এই ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরের কথা।

পুঁটুর বোন বুড়ীর (শ্রীমতী নিরুপমা দেবী) কি একটি ব্রত-উপলক্ষে পুঁটুদের বাড়িতে হ'ল প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা। নিরুপমা আমার ছোট দিদির (শ্রীমতী অনুরূপা দেবী) 'গঙ্গাজল' ; দু-জনে খুব ভাব এবং দু-পরিবারে খুব বেশী রকম অন্তরঙ্গতা ছিল। ব্রতের ভোজে আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে পুঁটুদের বাড়ী গেলুম। বেলা তখন প্রায় দশটা। পুঁটুর বসবার ঘরে বড় টেবিলের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক। যেন বহুকাল রোগভোগ করেছেন—এমন মূর্ত্তি! মাথার পাৎলা কেশ অবিন্যস্ত—মুখে অবিন্যস্ত কতকগুলো পাৎলা দাড়ি। ভদ্রলোকের সামনে টেবিলের

* "শৈশবে শরৎচন্দ্রের মাথায় কতকগুলি ফোড়া ও ঘা হইয়া মাথার চুল সব উঠিয়া যায়, এজন্য তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে তখন হইতে আদর করিয়া 'ন্যাড়া' বলিয়া ডাকিতেন।" (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১ মাঘ ১৩৪৫)

উপর বই খোলা—তিনি নিবিষ্টমনে বই পড়ছেন, মাঝে মাঝে মাথার কেশরাশির মধ্যে দু-হাত পরিচালনা ক'রে কি যেন ভাবচেন। আমাদের ছোটর দলে এ ভদ্রলোকটিকে দেখে আপনা হ'তে মনে সম্ভ্রম জাগলো।

আমরা আসন গ্রহণ করলে, পুঁটু ডেকে উঠলো—শরৎদা…

বুঝলুম, ঐ ভদ্রলোকটিই সেই খাতার পাতায় গল্প-লেখক St C. Lara, শরৎচন্দ্র।…

পুঁটু বললে—এই আমার সেই বন্ধু সৌরীন।…

এ কথায় শরৎচন্দ্র আমার পানে তাকালেন।…দু-চার সেকেণ্ড আমার পানে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি গল্প লেখো?

সভয়ে আমি বললুম—না।

পুঁটু বললে—ও কবিতা লেখে।

শরৎচন্দ্র আমার পানে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টি যেন আমাকে বিঁধতে লাগলো। তিনি বললেন—গল্প কেন লেখো না?

আমি বললুম—লিখতে পারি না।

শরৎচন্দ্র বললেন—পদ্য লেখো, আর গল্প লিখতে পারো না! গল্প লেখবার চেষ্টা করো। গল্প কাকে বলে, কিসে গল্প হয়, সে জ্ঞান তোমার আছে। পুঁটুর কাছে তুমি আমার গল্পের যে সমালোচনা করেছ, পুঁটু আমায় বলেছে। সেই সমালোচনা শুনে আমি বলছি—গল্প সম্বন্ধে তোমার idea আছে। তুমি গল্প লেখো।

সহর্ষে সগর্ব্বে আমি বললুম—লিখবো।

সেদিন এই পর্য্যন্ত।…

পুঁটুদের বাড়ী আমাদের যাতায়াত ছিল হামেশা।···এই সময়টায় শরৎচন্দ্র থাকতেন পুঁটুদের বাড়ী।···সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় যে সময়েই পুঁটুদের বাড়ী যেতুম, দেখ্‌তুম, শরৎচন্দ্র ব'সে আছেন সেই চেয়ারখানিতে। ঐ চেয়ারখানি ছিল তাঁর রিজার্ভ করা। বই পড়তেন—মোটা মোটা ইংরাজী বই। একবার সে বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়েছিলুম—ইংরাজী ফিলজফির বই, বায়লজির বই—এই সব বই পড়তেন।

গল্প লিখতেন অনর্গল। এ যাবৎ পুঁটু আর শ্রীমতী নিরুপমা দেবী এঁরাই ছিলেন পাঠক-পাঠিকা। সে দলে আমিও initiated হলুম।

মনে পড়ে, 'কোরেল' গল্প লিখছিলেন।···লেখবার সময়ে বলতেন—বিলাতী পাত্র-পাত্রী নিয়ে গল্প লিখছি, বড় গল্প। ট্রানশ্লেশন নয়—original...

মারি করেলীর *Mighty Atom* প'ড়ে বললেন,—ঐ গল্পের ছায়ায় একটি গল্প লিখবেন। লিখেছিলেন। গল্পটির নাম—'পাষাণ'।···পাষাণ করুণ রসের প্রস্রবণ। সে পাষাণ আমাদের চোখে জল ঝরিয়েছিল অজস্র!

'কোরেল,' 'পাষাণ' লেখার পরে লিখলেন—বড়দিদি, চন্দ্রনাথ।···

১৯০১ সাল। ফার্ষ্ট আর্টস পাস ক'রে কলকাতাতেই বি. এ. পড়া চললো।···ভাগলপুর থেকে একজামিন দিয়ে ফেরবার সময়ে শরৎচন্দ্রের অনুমতিতে পুঁটুর হাত থেকে শরৎচন্দ্রের গল্পের দুখানি খাতা আমি নিয়ে আসি, ভবানীপুরের বন্ধুদের সে গল্প পড়িয়ে তাক

লাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। সে খাতার একখানিতে ছিল, 'বোঝা,' 'সুকুমারের বাল্যকথা,' 'কাশীনাথ,' 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি গল্প; অপরখানিতে ছিল 'কোরেল,' 'চন্দ্রনাথ,' 'বড়দিদি' প্রভৃতি।... ভাগলপুর থেকে আমি আর একটি সংবাদ নিয়ে এসেছিলুম। পুটু, সুরেন, গিরীন, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা বার করবে—পত্রিকার নাম 'ছায়া'। তার সম্পাদক হবেন আমাদের ভাগলপুরের সতীর্থ-সুহৃদ্ যোগেশ মজুমদার। ("শরৎ-স্মৃতি" : 'দীপালি,' ১২ ফাল্গুন ১৩৪৪)

শরৎ চন্দ্র শুধু যে শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকই ছিলেন তাহা নয়,—সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির অক্লান্ত পাঠকও বটে। এই পাঠাসক্তির বীজ তরুণ বয়সেই তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যরচনায় কোন কোন ইংরেজ লেখক ও লেখিকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তরুণ বয়সে কি ধরনের বই তিনি পড়িতেন, কোন্ কোন্ ইংরেজ ঔপন্যাসিক তাঁহার প্রিয় ছিলেন, কাহাদের রচনা তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন, সৌরীন্দ্রমোহনের স্মৃতিকথা হইতে আমরা তাহার কতকটা আভাস পাই; বিভূতিভূষণের রচনা হইতে এ সকল বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অধিকতর নিবৃত্ত হয়। তিনি লিখিতেছেন—

শরৎচন্দ্র সে সময় যে সকল ইংরাজী ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়িতেন তাহা এখনো আমার মনে আছে। মিসেস হেন্‌রি উড্ এবং মারি করেলীর উপন্যাসের তিনি একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং লর্ড লিটনের প্রতিও তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহারই প্রমাণ

তিনি দিয়া গিয়াছেন লিটনের My Novelএর ধরণে শ্রীকান্তের পর্ব্বের পর পর্ব্ব চালাইয়া।…

বাল্যজীবনে শরৎদাদা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশী করিয়া পড়িতেন তাহার মধ্যে চার্লস্ ডিকেন্স* বোধ হয় তাঁহার কাছে বেশী আদর পাইয়াছিলেন। অনেক দিন ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড হাতে করিয়া এখানে-সেখানে এ-বাড়ী ও-বাড়ী পর্য্যন্ত করিতে দেখিয়াছি। মিসেস হেন্‌রি উডের ইষ্টলিন্ খানিও প্রায় তদ্রূপ আদরই পাইয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখার মধ্যে ডিকেন্স বা উডের লেখার তেমন প্রভাব দেখা গিয়াছিল কি না সন্দেহ। বোধ হয় মধ্য বয়সে কলিকাতা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তিনি যে সমস্ত আধুনিক লেখকদের লেখার সহিত পবিচিত হইয়াছিলেন তাহারই ফল তাঁহার লিখিত উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন। ('ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪)

শরৎ চন্দ্রের প্রথম যৌবনে লেখা যে সমস্ত গল্প† রচনা পরবর্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিতেও তাঁহার প্রতিভার স্পর্শ রহিয়াছে।

* পরিণত বয়সেও তিনি ডিকেন্সের ভক্ত ছিলেন।—'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র,' পৃ. ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য।

† ১৬-১৭ হইতে ২৪-২৫ বৎসরের মধ্যে লেখা শরৎ চন্দ্রের কয়েকটি প্রাথমিক রচনা:—(১) 'অভিমান' (হেন্‌রি উডের 'ইষ্টলিনে'র ছায়াবলম্বনে)। (২) 'বাসা' বা 'কাকবাসা' (উপন্যাস)। (৩) 'বাগান' তিন খণ্ডে সমাপ্ত: ১ম খণ্ড—বোঝা, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম; ২য় খণ্ড—'কোরেল গ্রাম' (পরে 'ছবি'), 'শিশু' (পরে 'বড়দিদি') ও 'চন্দ্রনাথ'; ৩য় খণ্ড—'হরিচরণ', 'দেবদাস' ও 'বাল্যস্মৃতি'। (৪) 'পাষাণ' (মারি করেলীর *Mighty Atom* অবলম্বনে)। (৫) 'ব্রহ্মদৈত্য' (উপন্যাস), ও (৬) 'শুভদা' (এই অসম্পূর্ণ রচনা পরবর্তী কালে শরৎ চন্দ্র সম্পূর্ণ করেন)। এই সকল প্রাথমিক রচনার মধ্যে 'বাগান' ও 'শুভদা' মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গদ্য শুধু যে সহজ ও সাবলীল তাহা নহে, তাহার মধ্যে একটা গতিবেগ এবং ছন্দও আছে; স্থানে স্থানে কবি-দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কথা-সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র যে সাহিত্য-জীবনের উষাকালে কাব্য-সরস্বতীরও আরাধনা করিয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায় বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিতা নিরুপমা দেবীর স্মৃতিকথায়; তিনি লিখিয়াছেন—

> শরৎ দাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—'ফুলবনে লেগেছে আগুন'। সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথা'র বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল। ('ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪, পৃ. ৫৯৬)*

যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও শরৎ চন্দ্র ছেলেবেলা হইতেই গতানুগতিক পথ ধরিয়া চলেন নাই; তরুণ বয়সেই নূতন পথে তাঁহার যাত্রা, তিনি পথিকৃৎ। তাঁহার আদর্শ বাল্যকালের সাহিত্য-সঙ্গীদেরও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অল্পবয়স হইতেই শরৎ চন্দ্র ছিলেন নির্ভীক,

---

* 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' পুস্তকে (পৃ. ৮৪) শরৎ চন্দ্রের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :— "দেখ, কবিতা টবিতা এককালে বাই আমারও ছিল। আমি গাথা লিখ্‌তে জানতাম।"

স্বাধীনচেতা। তাঁহার বিদ্রোহী মন কোন বন্ধন স্বীকার করিতে চাহিত না। সাহিত্যে তিনি নির্ভীকভাবে নিজের অভিজ্ঞতা ও সত্যোপলব্ধিকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, গোড়া হইতেই তাঁহার রচনায় যুক্তিহীন সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই নিয়মের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিবার প্রবণতা এবং বেপরোয়া ভাব ছিল বাল্যকাল হইতেই তাঁহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণের নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য—

আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলা কবর আছে। আমরা হিন্দুর ঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকটির সঙ্গগুণে 'মামদো' ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবরস্থানের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনের রক্তনয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিম্বা থিয়েটারের রিহার্সাল-কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্চিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে তিনি ভয় কাহাকেও করিতেন না এবং কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বাধাও তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। বহু দিনের বহু কার্যে তিনি ইহা দেখাইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার পরবর্তী জীবনে তাঁহার

নিজ প্রকৃত জীবনের এবং সৃষ্ট জীবনের মধ্যেও সেই একান্ত নির্ভীকতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমাদের মত অনেক ভীরু যেখানে গিয়া থামিতে বাধ্য হইয়াছে তিনি সেখানে থামেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎ চন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধার কথা সুবিদিত। তিনি তাঁহাকে অন্তরে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, এক মাত্র বেদব্যাস ছাড়া এত বড় কবি আর আমাদের দেশে জন্মান নাই। ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত কি করিয়া তাঁহার পরিচয় হয়, সেই প্রসঙ্গে শরৎ চন্দ্র বলিয়াছেন—

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙ্গা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা-কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন

সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি ক'রে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হ'তে; এরই মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় [মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়] তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন প'ড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানি নে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয়

ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ-বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না; আবার ফিরতে হ'ল আমাদের সেই পুরণো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারি নে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই ক'রে নিতে হ'ল আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়ি নে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানি নে। একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হ'ল শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক্ দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তার পরে এল বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে

দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ্ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়? ('জয়ন্তী-উৎসর্গ')

অন্নসংস্থানের চেষ্টায়

পত্নীবিয়োগের পর মতিলাল শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পুত্রকন্যা সহ ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় বাস করিতেন। দেনার দায়ে তিনি দেবানন্দপুরের বসতবাটীখানিও ২২৫৲ টাকা মূল্যে কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন (৯ই নবেম্বর ১৮৯৬)।* এই সময়ে পরিবারে অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় শরৎ চন্দ্রের পক্ষে বেশীদিন বেকার বসিয়া থাকা সম্ভবপর হইল না, অগত্যা তাঁহাকে অর্থোপার্জনে মন দিতে হইল। গোড্ডায় রাজ-বনেলী এস্টেটে তাঁহার একটি চাকুরিও জুটিয়া গেল। তিনি প্রসঙ্গক্রমে একবার শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন—

* "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র"—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী: 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪।

আমি কিছু দিন বনেলী ষ্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চল্‌চে। ষ্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্ম্মচারী সেই কাজে ষ্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন,' তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলেম।* ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন ক'রে নাচগানের মজলিস দিতেন। সেই সময় আমরা কয়েকজন মিলে বক্রেশ্বর বেড়াতে যাই। বক্রেশ্বরের শ্মশানটা আমার বড় ভাল লেগেছিল। শিবের মন্দিরের দিকটাও খুব নির্জ্জন। ('ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪, পৃ. ৬০৫)

অস্থিরমতি শরৎ চন্দ্রের মন বেশীদিন চাকুরিতে বসিল না ; চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় তিনি পড়াশুনা ও রচনা-চর্চায় মন দিলেন। তাহার পর ১৯০১ সনের শেষার্দ্ধে তিনি একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। শরৎ চন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত অভিমানী প্রকৃতির। অভিমান-ভরেই যে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার একখানি পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায় ; তিনি বন্ধু প্রমথনাথকে

* 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাঁওতাল পরগনার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† "শ্রাবণ ১৩০৮" (জুলাই ১৯০১) তারিখযুক্ত শরৎ চন্দ্রের একটি রচনা—"ক্ষুদ্রের গৌরব" (দ্র° 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী,' পৃ. ৩৬২-৯) সাহিত্য-সভার হস্তলিখিত পত্রিকা 'ছায়া'র স্থান পাইয়াছিল। সুতরাং এই তারিখের পূর্ব্বে তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করেন নাই, ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে।

লিখিতেছেন—"আমার অভিমান বড় কম নয়। কিছু কম হ'লে আর এমন নির্ব্বাসনে এত অজ্ঞাতবাসে থাকৃতে পারতাম না।" (রেঙ্গুন, ১৭-৪-১৯১৩)

সন্ন্যাসী-বেশে* বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর শরৎ চন্দ্র শেষে একটি নাগা-সন্ন্যাসী দলে ভিড়িয়া মজঃফরপুরে আসিয়া উপস্থিত হন (ইং ১৯০২ ?)। এখানে তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া ধর্মশালায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হয় নাই।† তাঁহার মজঃফরপুরে আগমন ও অবস্থান সম্বন্ধে শ্রীঅনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন—

> মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান বাজনায় তাঁর খুব সখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, 'একটি

---

* শ্রীকান্ত,' ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য।

† মজঃফরপুরে সন্ন্যাসিবেশী শরৎ চন্দ্র নিজের আসল পরিচয় লুকাইবার উদ্দেশ্যে মুখে অনর্গল হিন্দী বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যে একজন বাঙালী, ইহা কি করিয়া ধরা পড়ে, সে সম্বন্ধে "প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বসেছিলেন" এই নজিরে একটি গল্প শ্রীনরেন্দ্র দেব-লিখিত শরৎ-জীবনীতে স্থান পাইয়াছে। গল্পটির শেষে আছে—"প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে এই ভাবে তাঁর প্রথম পবিচয় হয়, সে পরিচয় পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।" এই গল্প আমি দুইটি কারণে সত্য বলিয়া মনে করি না। প্রথমতঃ, ইহা যে-সময়ের ঘটনা, প্রমথনাথ তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেন,—মজঃফরপুরে ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, তর্কের খাতিরে যদিও বা ধরিয়া লওয়া যায় তিনি কোন কারণে তখন মজঃফরপুরে ছিলেন, তাহা হইলেও এই ব্যাপারেই শরৎ চন্দ্রের সহিত তাঁহার "প্রথম পরিচয়" এই সিদ্ধান্তে কিছুতেই পৌঁছানো যাইতে পারে না। এই ঘটনার বহু পূর্ব হইতেই—১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৪) হইতে তিনি যে শরৎ চন্দ্রের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ. শরৎ চন্দ্রের একখানি পত্রই তাহার প্রমাণ—পত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

বাঙালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্ম্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়, অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু তা নয়, লোকটি বাঙালীই। একদিন নিয়ে আসবো তাকে? গান শুনবে? তার খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—তোমার এখানে রাখতে পারলে ভাল হয়।'

বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা এক-এক দিন ভাল কোন গায়ক পাওয়া গেলে গান বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ীর অতিথিরূপে এইখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতই ছিল।···শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বাবু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন।

শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল।···অসহায় রোগীর পরিচর্য্যা, মৃতের সৎকার এমনই সব কঠিন কার্য্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিখরবাবুর বাড়ী থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছু দিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান। এই মহাদেব সাহুই যে 'শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেব তাহাতে সন্দেহ নাই।

গায়ক ও বাদক হিসাবে শরৎ চন্দ্র মহাদেব সাহুর সুনজরে পড়িয়াছিলেন। আমন্ত্রিত হইয়া তিনি কিছুদিন এই জমিদারের সাহচর্যে কাটান। এখানে তিনি 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ভাগলপুরে ছুটিতে হয়। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সাহুর নিকটেই পড়িয়া থাকে; পরে আর উহা পাওয়া যায় নাই।

১৯০২ সনের মাঝামাঝি মতিলালের মৃত্যু হয়। শরৎ চন্দ্র ভাগলপুরে পৌঁছিয়া অতি কষ্টে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। মতিলাল এমন কিছু রাখিয়া যান নাই যাহাতে অল্প কালের জন্যও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে। এই আকস্মিক বিপৎপাতে শরৎ চন্দ্র যেন অকূল সমুদ্রে পড়িলেন এবং ইহা হইতে ত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে রিক্তহস্তে হাইকোর্টের উকিল—"বোম্ মামা" লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলিকাতা, ভবানী-পুরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। উপেন্দ্রনাথও তখন অগ্রজের নিকট অবস্থান করিতেছেন। অনেক দিন পরে আবার শরৎ চন্দ্রকে পাইয়া উভয়েই দুঃখের মধ্যেও আনন্দিত হইয়াছিলেন। "বোম্ মামা" বেকার ভাগিনেয়কে কিছু কিছু উপার্জনেরও সুযোগ করিয়া দিলেন। উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এমন অনেক কিছু খরচপত্র থাকে যা প্রতি ক্ষেপে অভিভাবকের নিকট চেয়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। এই অসুবিধা থেকে মুক্তিলাভের জন্য শরৎচন্দ্র হিন্দী অনুবাদকার্য্য আরম্ভ ক'রে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করতে আরম্ভ করেন। হাইকোর্টের Paper Book তৈয়ারী করার ব্যাপারে দাদার

অধীনে অনেককেই অনেক কাজ করতে হ'ত। যিনি যে কাজ করতেন তিনি সে কাজের পারিশ্রমিক পেতেন, শরৎচন্দ্রও পেতেন। কিন্তু আইন-আদালতের ভাষার সহিত পরিচয়ের স্বল্পতা হেতু এই কার্য্য বেশী দিন চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ("শরৎ-চন্দ্রের মাতুলালয়" : 'শরৎ স্মরণিকা', ইং ১৯৪৯)

এই ভাবে কলিকাতায় শরৎ চন্দ্রের ছয়-সাত মাস কাটিল।

তাহার পর একদিন বাড়ির কর্তাদের অজ্ঞাতসারে তিনি ভাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন (জানুয়ারি ১৯০৩)। উপেন্দ্রনাথ গোপনে তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসেন।

ব্রহ্মপ্রবাস

উপেন্দ্রনাথ শরৎ চন্দ্রের আত্মীয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু ; এক গৃহে একই সংসারে অনেক দিন একত্রে কাটাইয়াছেন। শরৎ চন্দ্র তাঁহারই সহিত পরামর্শ করিয়া একদিন বাড়ির কর্তাদের অজ্ঞাতসারে ভাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন (জানুয়ারি ১৯০৩)। উপেন্দ্রনাথ গোপনে তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসেন ; যাইবার সময় কপর্দকহীন শরৎ চন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে চল্লিশটি টাকা কর্জ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিঃসম্বল অবস্থায় শরৎ চন্দ্র রেঙ্গুনে তাঁহার মাসীমা—উপেন্দ্রনাথের সহোদরা ভগ্নী অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়িতে (৫৬ ও ৫৬।এ লিউইস স্ট্রীট) গিয়া উঠিলেন। তাঁহার মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন

রেঙ্গুনের একজন নামজাদা উকিল। তিনি শরৎ চন্দ্রকে সাদরে আশ্রয় দিলেন এবং গৃহশিক্ষক রাখিয়া তাঁহাকে বর্মী ভাষা শিখাইতে লাগিলেন; দুই-তিন মাস পরে বর্মা-রেলওয়ের এজেণ্ট জন্ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার আপিসে পঁচাত্তর-আশী টাকার একটি চাকরিও সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অঘোরনাথের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, অদূর-ভবিষ্যতে শরৎ চন্দ্রকে ওকালতি-কার্যে বহাল করিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই; ১৯০৫ সনের ৩০এ জানুয়ারি নিউমোনিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে পত্নী অন্নপূর্ণা দেবী নিকটে ছিলেন না; কন্যার বিবাহের বন্দোবস্তের জন্য তিনি তখন কলিকাতায়। স্বামীর মৃত্যুর দেড় মাস পরে তিনি রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসেন। শরৎ চন্দ্র তাহার অল্পদিন আগেই সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অঘোরনাথের পীড়ার সময় তিনি যে ঘোর পানাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সংবাদ কলিকাতায় তাঁহার মাসীমার গোচরে আসিয়াছিল।

মেসোমশাইয়ের মৃত্যুর তিন-চারি মাস পরে শরৎ চন্দ্র সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়া এজেণ্ট আপিসের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর অন্নসংস্থান ব্যপদেশে রেঙ্গুন ছাড়িয়া 'লোয়ার'-ব্রহ্মে গমন করেন। সেখানে পিগুতে পি. ডবলিউ. ডি.র হিসাব-বিভাগে ডেপুটি এগজামিনার-অব-অ্যাকাউণ্টস এম. কে. মিত্রের সুপারিশে সত্তর-আশী টাকার একটি চাকুরি জুটিল (ইং ১৯০৫); তাঁহার উপরিওয়ালা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সি. কে. সরকার, তৎকালে অ্যাসিস্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার পি. ডবলিউ. ডি.। কিন্তু দুই-তিন মাসের

অধিক কাল শরৎ চন্দ্র এই পদে স্থায়ী হইতে পারেন নাই; তিনি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছেন, শনি হইতে মঙ্গলবার তাঁহাকে বড়-একটা আপিসে পাওয়া যাইত না।

শরৎ চন্দ্র আবার রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি রেলওয়ে হিসাব-বিভাগের এগজামিনার গঙ্গারাম কাউলার সাহায্যে তাঁহার অধীনে কেরানীর পদলাভ করেন; দুই-তিন মাসের পর এ চাকরিও তাঁহাকে ছাড়িতে হইল।

অতঃপর শরৎ চন্দ্র উক্ত মিত্র (ঝামাপুকুর-নিবাসী উকিল রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র) মহাশয়ের বাড়িতে কিছুদিন আশ্রয় গ্রহণ করেন। মণীন্দ্রবাবু পূর্ব হইতেই শরৎ চন্দ্রকে জানিতেন, বিশেষ করিয়া তাঁহার সুকণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় শরৎ চন্দ্র শেষে ডেপুটি অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আপিসে পাব্লিক ওয়ার্কস্ অ্যাকাউণ্টস্-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

শরৎ চন্দ্র ব্রহ্মদেশে দীর্ঘ বারো-তেরো বৎসর কাটাইয়াছিলেন।* মাঝে মাঝে ছুটি লইয়া অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। শিকারী, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিলিয়ার্ড খেলায় ওস্তাদ বলিয়া রেঙ্গুনে তাঁহার নামডাক ছিল। কিন্তু প্রবাসে কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদেই তাঁহার অবসরকাল অতিবাহিত হয় নাই; গভীর অধ্যয়নেও তিনি সময়ের

* শরৎ চন্দ্রের প্রবাস-জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' (১৩৩৩-৩৪ সালের 'বাঁশরী' হইতে পুনর্মুদ্রিত, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭) ও গিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' (জানুয়ারি ১৯৩৯) পুস্তকে মিলিবে। উভয়েই ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎ চন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি পত্রে লেখেন—

D. A. G.'s Office, Rangoon,
22. 3. 12.

প্রমথ,...আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনো মতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।...

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) ["৫ই ফেব্রুয়ারি রাতে"] আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript —'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে...'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।...

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য-সভা'র একটি মাত্র সভ্য 'নিরুপমা দেবী'ই সাহিত্যের চর্চ্চা রাখিয়াছেন—আর সকলেই ছাড়িয়াছে—এই না ?

...আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart diseaseএর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil-painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novei, History, Painting—কোন্‌টা ? কোন্‌টা আবার সুরু করি বল ত ?—তোমার স্নেহের শরৎ।

সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ

শরৎ চন্দ্রের সত্যকার সাহিত্য-জীবনের সূচনা—ব্রহ্মপ্রবাসে। দীর্ঘকাল সাহিত্যসৃষ্টি হইতে বিরত থাকিবার পর ঘটনাচক্রে এই রেঙ্গুনেই আবার তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতে শুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে বিবৃত আত্মকথায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হ'ল আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোন দিন লিখেছি। দীর্ঘকাল

কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানি নে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটে নি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাই নি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হ'ল বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কা'কে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কি না,—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করি নি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হ'ল না। ('জয়ন্তী-উৎসর্গ')

'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদের টম্‌সন-লিখিত ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট শরৎ চন্দ্রের বিবৃতিটিতেও ইহার উল্লেখ আছে। তিনি যে পিতার নিকট

হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে সাহিত্যানুরাগের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারও আভাস এই স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। মূল ইংরেজী বিবৃতি ও তাহার বাংলা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

In Sarat Babu's own words, "My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made, me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now—somehow it got lost; but I remember poring over those incomplete mss. over and over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what might have been their conclusion if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. But I soon gave up the habit as useless, and almost forgot in the long years that followed that I could even write a sentence in my boyhood. A mere accident made me start again, after the lapse of about eighteen years. Some of my old acquaintances started a little magazine, but no one of note would condescend to contribute to it, as it was so small and insignificant. When almost hopeless, some of them suddenly remembered me, and after much persuasion they succeeded in extracting from me a promise to write for it. This was in the year 1913. I promised most unwillingly—perhaps only to put them off till I had returned to Rangoon and could forget all about it. But sheer volume and force of their letters and telegrams compelled me at last to think seriously about writing again. I sent them a short story, for their magazine *Jamuna.* This became at once

extremely popular, and made me famous in one day. Since then I have been writing regularly. In Bengal perhaps I am the only fortunate writer who has not had to struggle."—*Srikanta* : E. J. Thompson, 1922.

আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন ক'রে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ ক'রে যান নি—এই ব'লে কত দুঃখই না করেছি! অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছু দিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে ক'রে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তার

পর অনেক বৎসর চ'লে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় ক'রে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও এক দিনেই নাম ক'রে বসলাম। তার পর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি। ('বাতায়ন,' শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৪)

শরৎ চন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা—১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" নামে গল্প।

ব্রহ্মদেশে যাত্রার প্রাক্কালে গল্পটি তিনি সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়াছিলেন (মাঘ ১৩০৯)। বলা বাহুল্য, উহা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ টাকা পুরস্কার লাভ করে। সে-বার পুরস্কৃত রচনাগুলির প্রথম দশটি নির্বাচন করিয়াছিলেন তৎকালীন 'বসুমতী'-সম্পাদক জলধর সেন।

ইহার চারি বৎসর পরে—১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে শরৎ চন্দ্রের অপরিণত বয়সের একটি রচনা—'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলা দেবীকে ইহার পাণ্ডুলিপি শরৎ চন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। অখ্যাত লেখকের এই রচনাটি তখন বাংলা-সাহিত্যে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি করে। অনেকের ধারণা জন্মে যে, রবীন্দ্রনাথ গল্পটি লিখিয়াছেন।

শরৎ চন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাগুলি ভাগলপুরে তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুলদের নিকটে ছিল। সেগুলি যাহাতে ক্রমশঃ লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় সেজন্য তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ ছিল। পাছে অপরিপক্ব রচনা প্রকাশে শরৎ চন্দ্র আপত্তি করেন, এজন্য তাঁহাকে না-জানাইয়াই "বড়দিদি" 'ভারতী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার বছর পাঁচেক পরে মাতুল উপেন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'যমুনা'য় "বোঝা" (কার্তিক-পৌষ ১৩১৯) এবং 'সাহিত্যে' "বাল্য-স্মৃতি" (মাঘ ১৩১৯), "কাশীনাথ" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "অনুপমার প্রেম" ও "হরিচরণ" প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল অপরিণত বয়সের রচনা ছাপার অক্ষরে দেখিয়া

শরৎ চন্দ্র প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ছেলেবেলার রচনা হুবহু মুদ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

পরিণত বয়সের রচনা-সম্ভার লইয়া মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় শরৎ চন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব যে ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিবেশী 'যমুনা'-সম্পাদকের বিশিষ্ট বন্ধু; ১৯১২ সনের শেষ ভাগে শরৎ চন্দ্র যখন অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় আসেন, তখন তিনিই ফণীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে উপেন্দ্রনাথেরই মধ্যস্থতায় শরৎচন্দ্র 'যমুনা'য় লিখিতে স্বীকৃত হন। রেঙ্গুনে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'যমুনা'র জন্য "রামের সুমতি" গল্পটি লিখিয়া পাঠান; তখন তাঁহার বয়স ৩৬। ঘন ঘন পত্র-বিনিময়ের ফলে ফণীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। 'যমুনা'কে নিয়মিত ভাবে রচনা দিয়া সাহায্য করিবেন—এ প্রতিশ্রুতি শরৎ চন্দ্র একাধিক পত্রে দিয়াছেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখে তিনি রেঙ্গুন হইতে ফণীন্দ্রনাথকে লেখেন—

> আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।...আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়—।
>
> আপনি পূর্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home...

প্রকৃত পক্ষে ১৩১৯ সালের শেষার্ধ হইতে ১৩২১ সাল পর্যন্ত 'যমুনা'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় শরৎ চন্দ্রের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা

সমালোচনা—কোন-না-কোন রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি বড় দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামেও কতকগুলি প্রবন্ধ—"নারীর লেখা," "নারীর মূল্য," "কানকাটা" ও "গুরু শিষ্য সম্বাদ" ১৩১৯-২০ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে; এই সময়ে তিনি 'যমুনা'-সম্পাদনে ফণীন্দ্রনাথকে রীতিমত সাহায্য করিতেন। রেঙ্গুন হইতে 'যমুনা'র জন্য প্রবন্ধ ও গল্পাদি নির্বাচন করিয়া পাঠাইতেন।

'যমুনা'য় "রামের সুমতি" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "পথ-নির্দ্দেশ" (বৈশাখ ১৩২০) ও "বিন্দুর ছেলে" (শ্রাবণ ১৩২০)—এই তিনটি নূতন গল্প উপর্যুপরি প্রকাশিত হইবার পর চারি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল।

সুদূর প্রবাসে লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘদিন ধরিয়া যখন তাঁহার নীরব-সাহিত্য-সাধনা চলিতেছিল, তখন নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই-এক জন ছাড়া আর কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। তাই যখন তিনি তাঁহার অপূর্ব রচনাসম্ভার লইয়া সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন বাঙালী পাঠক-সম্প্রদায় চমকিত হইয়া দেখিল—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।" শরৎ-সাহিত্যের অভ্রভেদী মহিমা সেদিন সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

রচনার জন্য বড় বড় পত্রিকাগুলির উপরোধ-অনুরোধ রেঙ্গুনে শরৎ চন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অন্যতম প্রধান কর্মী, মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সনির্বন্ধ

অনুরোধে শরৎ চন্দ্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কতকাংশ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন—অন্তরঙ্গ বন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রথমে 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'তেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' উহা গৃহীত না হওয়াতে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। 'চরিত্রহীন' প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র সহিত শরৎ চন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইল না; ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায় 'বিরাজ বৌ' এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। এক দিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথের প্রবল আকর্ষণ, অপর দিকে রচনার বিনিময়ে নিয়মিত দক্ষিণাপ্রাপ্তি—শরৎ চন্দ্র 'ভারতবর্ষে' রচনা প্রকাশে যেন ক্রমেই অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। এদিকে পাছে তিনি 'যমুনা'র সহিত যোগাযোগ রক্ষা না করেন, এই ভাবিয়া ফণীন্দ্রনাথ রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। 'যমুনা'র সহিত শরৎ চন্দ্রের সম্পর্ক যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি এক নূতন ব্যবস্থা করিলেন। ১৩২১ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'যমুনা'র শেষে "সংবাদ"-বিভাগে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল—

> যমুনার পাঠকগণ বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান মাস হইতে যমুনার সম্পাদন-কার্য্যে যোগদান করিলেন। যমুনার পাঠকগণের নিকটে শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত—অতএব পরিচিতের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

পরবর্তী শ্রাবণ-সংখ্যা হইতে অন্যতর সম্পাদক-রূপে শরৎ চন্দ্রের নাম 'যমুনা'য় মুদ্রিত হইতে থাকে।* কিন্তু ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' শরৎ চন্দ্রের কয়েকটি নূতন রচনা—"পণ্ডিত মশাই" ও আরও তিনটি গল্প প্রকাশিত হইল; এই বৎসরের প্রথমার্ধেই আবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স কর্তৃক 'বিরাজ বৌ' ও 'বিন্দুর ছেলে…' এবং রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স কর্তৃক 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশাই' প্রকাশিত হইল। শরৎ চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" অসমাপ্ত রাখিয়া, তিনি 'যমুনা'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। অতঃপর শরৎ চন্দ্রের রচনার জন্য প্রধানতঃ 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন

ব্রহ্মদেশে শরৎ চন্দ্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল; তাঁহার পক্ষে সে দেশ ত্যাগ করা অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন হইতে লিখিলেন—

ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ

* পরবর্তী কালে যুগ্ম-সম্পাদকরূপে আর একখানি পত্রিকার সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত দেখা যায়; উহা—'রূপ ও রঙ্গ' নামে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ আশ্বিন ১৩৩১ (৪ অক্টোবর ১৯২৪)। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ইহার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন।

আবার আরও খারাপ। এ গুলি বর্ম্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবান্‌ই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব। (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬)

এই সময়ে মাসিক এক শত টাকা আয়ের ভরসা দিয়া হরিদাসবাবু শরৎ চন্দ্রকে কলিকাতা চলিয়া আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। শরৎ চন্দ্র অকূলে কূল পাইয়া এক বৎসরের ছুটিতে কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা ফিরিতে মনস্থ করিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে* তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।

রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া শরৎ চন্দ্র বাজে-শিবপুরে অবস্থিতি করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের নূতন অধ্যায়

* ১৯১৬ সনে জাপান যাইবার পথে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে দুই দিন অবস্থান করেন। ৮ই মে স্থানীয় জুবিলী-হলে বিরাট্ জনসভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, সভায় তাহা পাঠ করেন—কবিবর নবীনচন্দ্রের পুত্র ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র সেন। এই অভিনন্দন-পত্র রচনা করিয়া দিয়াছিলেন—শরৎচন্দ্র (১৯৩১, ডিসেম্বর মাসে জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহাও শরৎ চন্দ্রের লিখিত)। গিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' পুস্তকে অভিনন্দন-পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ২২৬-২৮); গিরীন্দ্রনাথের সনির্বন্ধ অনুরোধেই শরৎ চন্দ্র ইহার রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সম্বর্দ্ধনা-সভাতেও উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার অব্যবহিত পরে মে মাসেই শরৎ চন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। তিনি কলিকাতা হইতে পরবর্তী ১৯এ সেপ্টেম্বর প্রমথ চৌধুরীকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—"প্রায় মাস পাঁচেক হ'তে চলল আমি এ দেশে এসেচি।"

আরম্ভ হইল, উত্তরোত্তর তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে অপরাজেয় কথাশিল্পী-রূপে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সভা-সমিতিতে যোগদান, রচনার জন্য উপরোধ-অনুরোধ, দর্শনার্থীদের ভিড় ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ হইয়া শহরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এগার শত টাকা দিয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত বর্তমান পানিত্রাস গ্রামে, বড় দিদি অনিলা দেবীর বাটীর সন্নিকটে, এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া গৃহনির্মাণ করেন (ইং ১৯২৫)। ইহার বছর-দশেক পরে তিনি জীবনসঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছায় কলিকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডেও একটি বাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন (জুলাই ১৯৩৪)।

রূপনারায়ণের তীরস্থ নিভৃত পল্লী-নিকেতনেই তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। সেখানকার শান্ত পরিবেশে সরলপ্রাণ দীনদরিদ্র পল্লীবাসীদের সাহচর্যে তাঁহার মন শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিত। কলিকাতা হইতে সাহিত্যিক ও অনুরাগিবৃন্দ প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। এমনিভাবে শরৎ চন্দ্রের পানিত্রাসের পল্লীভবন সাহিত্যিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

শরৎ চন্দ্র সারা জীবনই ছিলেন সঙ্গীতের অনুরাগী। সঙ্গীত-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি পানিত্রাসের পল্লীনিবাসে বেতার যন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বেতার-সঙ্গীত শুনিয়া তিনি অবসর বিনোদন করিতেন। পল্লী-প্রকৃতির

পটভূমিকায় বেতার-বাহিত সঙ্গীত শ্রবণের বড় একটি মনোরম চিত্র তাঁহার তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

শহর হইতে দূরে গ্রামের মধ্যে আমার বাস। অতীতের নানাপ্রকার আমোদ ও আনন্দের প্রাত্যহিক আয়োজন গ্রামে আর নাই, পল্লী এখন নির্জীব নিরানন্দ। কর্ম্মক্লান্ত দিনের কত সন্ধ্যার এই নিঃসঙ্গ পল্লীভবনে বেতারের জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছি। শ্রাবণের ঘন মেঘে চারি দিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দ্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্যপথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের 'পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়াও আসরের ভাগ পাইতেছি।

আবার কোনোদিন ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা দেয়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদী-তটে আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতার বাঁশীর সুর যেন মায়াজাল রচনা করে। দু-এক জন করিয়া প্রতিবেশী জুটিতে থাকে, ঘাটে বাঁধা নৌকায় দূরের যাত্রী, কৌতূহলী দাঁড়ী-মাঝির দল নিঃশব্দে আসিয়া ঘিরিয়া বসে, আবার শেষ হইলে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে যাহার আলয়ে চলিয়া যায়। এই আনন্দের অংশ আমি পাই।

সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্রের বক্তব্য

শরৎ-সাহিত্য বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাঁহাকে কম দুঃখ-দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সকল সম্প্রদায়ের নর-নারীর সংস্পর্শে আসিবার এবং তাহাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বাল্যবন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার তিনি বলিয়াছিলেন—

> চারু, আমার মতো ক'রে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হ'ত তাহ'লে তোমরা উপন্যাস লিখ্‌তেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগ্দীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তার পর খুব ভাল ক'রে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তা ছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা। ("শরৎস্মৃতি" : 'প্রবাসী,' কার্তিক ১৩৪৫)

সমাজের অত্যাচারিত ভাগ্যহত বঞ্চিত নর-নারীর যে ব্যথা-বেদনা শরৎ চন্দ্র মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির

মূল উৎস। শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে এই অনুযোগ কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, তাহার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সৃষ্ট চরিত্রগুলিও একই ছাঁচে গঠিত। এ অভিযোগ শরৎ চন্দ্র অস্বীকার করেন নাই; ইহার হেতু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমাব মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতী-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘট্‌লো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু, অন্তরে যাকে পাই নি, শ্রুতি-মধুর শব্দ-রাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি ব'লে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করি নি। এম্‌নি আরও অনেক কিছুই— এ জীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলে নি স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা

তাঁদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত ক'রে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করি নি। (৫৭ জন্মদিন উপলক্ষে টাউন-হলে স্বদেশবাসীর অভিনন্দনের প্রতিভাষণ)

সমাজের সকল স্তরের নরনারীর সঙ্গে মিশিয়া শরৎ চন্দ্রের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, মানুষের আসল সত্তা তাহার দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা-অপরাধ ইত্যাদি হইতে ঢের বড়। সমাজ-পরিত্যক্ত অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও তিনি মনুষ্যত্বের বিরাট্ মহিমাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বহু আয়াসে লব্ধ অভিজ্ঞতাকেই তিনি তাঁহার সাহিত্যে রূপ দান করিবার প্রয়াস পান, তাহাতে প্রচলিত সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে বা রুচিবাগীশদের উৎকট নৈতিক বোধ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এ কথা ভাবিয়া সত্যের প্রকাশে বিরত হন নাই।

কিন্তু তথাকথিত সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদের ক্ষমা করেন নাই। শরৎ-সাহিত্য লইয়া সেদিন সাহিত্যক্ষেত্রে তুমুল বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। শরৎ চন্দ্রের সাহিত্য অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট, তাহাতে দুর্নীতির সমর্থন আছে, পাপের চিত্র এবং পাপীর চরিত্রকে তিনি মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন,—এরূপ অভিযোগ কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে, অভিভাষণে ও পত্রাদিতে শরৎ চন্দ্র এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ-সমূহ হইতে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে—

...আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জ্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন! আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য-ব্যবসায় আজও আমার বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্ত্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই। ("আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ")

* * *

…সুদূর প্রবাসে কেরাণীগিরি করতাম, ঘটনাচক্রে বছর দশেক হ'ল এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। খান কয়েক বই লিখেছি, কারও ভাল লেগেছে, অনেকেরই লাগে নি,—পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ[?] করেছেন যে, বাঙ্গলা ভাষার আমি একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে দিয়েছি। এত সত্বর এত বড় দুষ্কার্য্য কি ক'রে করলাম, তাও আমি বিদিত নই, কি-ই বা এর কৈফিয়ৎ সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।…

…আমার নিজের পেশা উপন্যাস-সাহিত্য, সুতরাং এই সাহিত্যের দু'একটা কথা বলা বোধ করি নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা ব'লে গণ্য হবে না। যাঁরা আমার নমস্য আমার গুরুপদবাচ্য তাঁদের লেখা থেকে এক আধটা উদাহরণ দিলে যদি বা একটু বিরুদ্ধ মত থাকে, আশা করি আপনাদের কেহই তাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা ব'লে ভুল করবেন না। আমার সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনও আছে। গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি না কি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি ক'রে যে এই দুটোকে ভাগ ক'রে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হ'তে পারে, কিন্তু সে

কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র-সৃষ্টি কি এতই সহজ?···আমি ত জানি কি ক'রে আমার চরিত্রগুলি গ'ড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করছি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে তা[?] আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে এমন গোলযোগ বাধবে যে, কাল তাকে ক্ষমা করবে না। নীতি-পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।

আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু আর রইল না! ভালই হ'ল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক্? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর

কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা ক'রে মরেছে।

…শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার 'পল্লী-সমাজে'র বিধবা রমাকে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন, "তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কি না তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ।" এ ধিক্কার artএর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এই ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।…

ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে,—ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলায় কোন artই কোন দিন আপত্তি করে না। কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে, নির্ব্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

অর্থাৎ, যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলি নে, তেম্নি যা ঘটে না, অথচ, সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক্ দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

আমার অবসর অল্প, বক্তব্য বস্তুকে আমি পরিস্ফুট করতে পারি নি, এ আমি জানি, কিন্তু আধুনিক-সাহিত্য রচনায় সমাজের এক শ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ

ও ক্রোধের উদয় হয়েছে, বিরোধের আরম্ভ যে কোন্‌খানে, সে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাটুকু বোধ করি আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর ক'রে তোলবার আমার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই, শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পথে কোথায় বাধা পেয়ে আমরা যে অন্য পথে চল্‌তে বাধ্য হয়ে পড়েছি, সেই আভাসটুকু মাত্র আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম।" ("সাহিত্য ও নীতি")

* * *

"...'পল্লী-সমাজ' ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা কেউ আর থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ

নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হয়ে যেত।

আগেকার দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না, ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয় নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানা দিক্ দিয়া[?] এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোটখাট কারণ থাক্‌লেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা ব'লে মানি নে। বহু দিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয়

মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়।… সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে উঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ কাউকে চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই এক ভরসা, propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বস্তু বহু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।…

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙ্‌রা ক'রে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টাটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতিপুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে গল্পচ্ছলে যদি এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক

নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?…এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে। ("সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি")

* * *

…নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায় নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা[?] কোন দিন যেন না এত বড় অন্যায় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ ব'লে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর

চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানি নে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না, এ বিচার ক'রেও দেখি নি, শুধু সে দিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না, এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।...সৃষ্টির কালটাই হ'ল যৌবনকাল—কি প্রজা-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্য-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম ক'রে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝ'রে পড়ে, তার উৎস-মুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই,—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন—তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের। ("৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে অভিভাষণ")

* * *

'চরিত্রহীন' এর নাম !—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়। টলষ্টয়ের 'রিসরেক্শন্' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে

চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?…টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু এক দিন শুনিবেই।…একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই।" ('শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী,' পৃ. ৪০)

*　　　*　　　*

বু—ব লিখেছে সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে প'ড়েই থাকতুম। কিন্তু মেসে প'ড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না, তা ছাড়া ছেলেটি একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি-শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মী দেবীও দায়ে প'ড়ে একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জ্জুন উত্তরাকে যখন নাচগান শেখাতেন তখন তাঁর কথা শুনে এ কথা বলা চলে না যে এ রকম ভেড়ুয়া পেলে সব মেয়েই নাচগান শেখার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। বেশ্যার কাছে যে-বেশ্যা দাসী হয়ে আছে তার চাল-চলন এবং তার মনিবের চাল-চলন এক না

হ'তেও পারে। এদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আট আনা এক টাকা খরচ করলেই চলে কিন্তু ওদের জানবার অনেক ব্যয়। সহজে তাদের দেখা মেলে না, তারা রঙ মেখে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে না…। যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে তাদের idealism ত নেই-ই realismও নেই। আছে শুধু অবিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।" ('শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী,' পৃ. ১২৫-৭)

* * *

আমি আজ পর্য্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে লিখেছি, আমি কখনো ফাঁকি দিয়ে লিখি না, আমার কোনো লেখায় একটি কথাও আমি অযথা লিখি না—একটি কথাও বদ্‌লাতে পারি না। আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমি পাপের বিকৃত জঘন্য রূপ দেখাবার জন্যেই পাপচিত্র এঁকেছি, সাহিত্যের রুচির বা নীতির কোনো আইন কখনো অমান্য করি নি। হয়ত কোনো কোনো জায়গায় আর-এক পা বাড়ালেই সেটা দুর্নীতিমূলক সাহিত্য হয়ে পড়ত, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি কোথায়ও সেই সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাই নি। ('শনিবারের চিঠি,' ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ৭)

শরৎ-সাহিত্য যে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত, তাঁহার এই সমস্ত উক্তি হইতে তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সংসার ও সমাজের যে দিক্‌টা নিজে তিনি দেখেন নাই, বা যাহার স্বরূপ

উপলব্ধি করেন নাই, তাহাকে সাহিত্যে রূপ দান করিবার প্রয়াস হইতে তিনি বিরত ছিলেন। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারে মানুষ হওয়াতে যে বহু বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁহার হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গল্প-উপন্যাসের অনেক পাত্র-পাত্রীর চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের অবয়বে হঠাৎ এক এক সময়ে দেখতে পাই প্রাচীন গাঙ্গুলী-পরিবারের কর্ত্তা-গৃহিণী বউ-ঝিয়ের সুস্পষ্ট ঝিলিক।" মাতুলালয়ের অনেক ঘটনাকে তিনি বাস্তবে কল্পনায় মিশাইয়া সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন। এমন কি, মাতুলদের নামে তিনি উপন্যাসের অনেক পাত্র-পাত্রীর নামকরণ পর্যন্ত করিয়াছেন—যেমন, 'বড়দিদি'তে সুরেন্দ্র, 'পরিণীতা'য় গিরীন্দ্র, 'চরিত্রহীনে' উপেন্দ্র (উপীন) এবং 'বিপ্রদাসে' বিপ্রদাস। শরৎ-সাহিত্যে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে স্নেহ প্রেম ভালবাসা হিংসা বিদ্বেষের যে চিত্র পাওয়া যায়, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহা এমন সত্য ও সজীব।

রচনা-কৌশল সম্বন্ধে শিল্পী শরৎ চন্দ্র

সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে লিপি-সংযম যে একান্ত প্রয়োজন, শরৎ চন্দ্র সে বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। রচনা-কৌশল সম্বন্ধে তিনি কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে

লিখিত চিঠিপত্র হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী' পুস্তক হইতে এ সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল—

আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।...

গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধরো তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর মামলা মোকদ্দমার মধ্যে, তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুর চাকরির মধ্যে, উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভালো করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,—তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

* * *

সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও আয়ত্ত করা চাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল ক'রেই কাজ হবে না... কতটুকু লিখতে হয়, কোন্‌টা বাদ দিতে হয়, কোন্‌টা চেপে যেতে হয়...

"ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

এত বড় সত্য কথা আর নেই। দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট ক'রে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।

* * *

রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেক্‌নিক বল—এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ, পাঠকের দল এমনি কুড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌছতে পারে। এই হদিসটুকুই মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।

* * *

ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না তারা যেমন তুলি হাতে

করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়—না, তা নয়। অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা, না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

…বইটা ছোট করার দরকার গোড়ার দিকে। এটা হচ্ছে একটা কৌশল। পড়ার interest গোড়ার দিকে অন্ততঃ যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

* * *

Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশী বলেছে। এই হ'ল artistic form-এর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হ'ল না, পাঠকেরা বোধ হয় ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না, কিন্তু এইখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল। না বোঝে বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু বেশী বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়।

* * *

এই কথাটা তোমাদের অনেক বার বলেছি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি।

অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জলধর-দা তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। কেদার বাঁড়ুজ্যে চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অ—রের লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ 'আদেক্‌লে-পনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীন মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ—ক'রে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু ক'রে আছেন।

কি হ'ল?

বড্ড কাঁচা শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেছি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না।...অ—পা দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে বেদ বেদান্ত

উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে,—ত্যাখো তোমরা আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি। এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এম্‌নি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছার বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাকে কখনো কৃপণতা করব না এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুল্‌লে চল্‌বে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ, এই নিয়েই চলা চাই লেখা,—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল আর জায়ে জায়ে ঝগড়া আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিম্বা প্রভাত মুখুজ্যের বর্ণনার নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা সল্‌তে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি-পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা, অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস ক'রে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-

মুখে-ঝাল-খাওয়া-কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হ'ল যার নীরস, বাঙলা দেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দু-দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখো নি বাঙলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে, এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত।

* * *

ছেলে বয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে, অনেক-বই-পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে নিজের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু মুখস্থ-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা। মেয়েটিকে তুমি অতো দ্রুতবেগে লিখতে বারণ ক'রো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর qualification—লেখকের নয়। এ কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক্, বা নারীর ওপরেই হোক্।...জীবনে

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই প'ড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া পর্য্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকতেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেছি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না ক্রিটিকও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশী বয়সে লেখক যখন লিখতে চায়, ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক, রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে যে ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো, উপন্যাস বলো, আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্ছে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।

* * *

এই প্রসঙ্গে নিজের রচনা সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্র বলিয়াছেন—

প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য

যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে। (৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজ, বঙ্কিম-শরৎ সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ)

রাজনৈতিক মতামত

শরৎ চন্দ্র শুধু যে একজন অপরাজেয় কথা-শিল্পীই ছিলেন তাহা নহে, তিনি মনীষারও অধিকারী ছিলেন। মনীষী শরৎ চন্দ্রের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তকে এবং সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার নানা প্রবন্ধে। শুধু কথা-সাহিত্যিকরূপে নহে, প্রবন্ধকাররূপেও শরৎ চন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করিতে পারেন।

সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্রের প্রবন্ধসমূহ পাঠক-মহলে সুপরিচিত, কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সহিত বাংলার পাঠক-সাধারণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। শরৎ চন্দ্র শুধু যে বাংলা, তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা নহে, সক্রিয়ভাবে বাংলার

রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান এবং অনেক দিন হাওড়া জিলা-কংগ্রেস-কমিটীর সভাপতিরূপে কার্য করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রেই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার সুগভীর স্বদেশ-প্রেম এবং জাতীয় আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেন—

তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাঙ্গলার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জিলায় বিতরণ করিয়াছেন,...

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের এক দিনের কথা আমার মনে আছে; এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—'কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য নহে।' শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—'আমি কিন্তু কিছু দিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।'

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্ত্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড়-একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশ-প্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকার তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চির-সবুজ—তরুণ বাঙ্গলার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ('ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৪)

বাংলার এই শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্তে কেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, দেশের মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে কি আদর্শ তিনি পোষণ করিতেন এবং কেনই বা তিনি অবশেষে এ দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বিরূপ হইয়া হাওড়া কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত কথা আলোচনা না করিলে শরৎ চন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল, বহু প্রবন্ধে নিজস্ব অনমুকরণীয় সরস ভাষায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহার

মধ্যে কোন-কোনটি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য, তাহাতে রাজনীতি বিষয়ে শরৎ চন্দ্রের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়।

জয়মাল্য

শরৎ চন্দ্র স্বদেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন, অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই তাহা ঘটে। দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী স্বুবর্ণপদক প্রদান করেন; পূর্ব-বারে (ইং ১৯২১) এই পদক রবীন্দ্রনাথকেই সর্বপ্রথম দেওয়া হয়। ১৯২৫ সনে তিনি ঢাকা, মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং ১৯৩৪ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা-বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডি. লিট.' বা সাহিত্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতের অন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলি অনুবাদ ও আত্মসাতের দ্বারা শরৎ চন্দ্রকে প্রভূত সম্মান দেখাইয়াছেন। সুদূর ইউরোপেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তারলাভ করিয়াছে। তাঁহার 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী সংস্করণের ইতালীয় অনুবাদ পাঠে মুগ্ধ হইয়া মনস্বী রমঁ্যা রলাঁ তাঁহাকে পৃথিবীর "প্রথম শ্রেণী"র ঔপন্যাসিকের সম্মান দিয়াছিলেন।*

* 'প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ. ২৫০।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাকে তিনি আদর্শ করিয়াছিলেন। কবির প্রতি যে শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করিতেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কবিও তাঁহাকে জয়মাল্যদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ সালের ২৫এ আশ্বিন শরৎ চন্দ্রের ৬১তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করেন—

> কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র—তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণসভা।
>
> বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেষণপাত্র তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।···

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময় মনের খেদে ভুলে যায়।···যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার

বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান ক'রে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলার ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয় কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত

মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য ক'রে দেখতে, স্পষ্ট ক'রে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।" ('বিচিত্রা,' অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩)

মৃত্যু

নানা রোগের আক্রমণে শরৎ চন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। শেষে অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহাকে পার্ক নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার করিয়াও কোন ফল হইল না। ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ (২ মাঘ ১৩৪৪) তারিখে, ৬২ বৎসর বয়সে, তাঁহার আত্মা বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করিল। রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে শোকাহত দেশবাসীর মর্মবেদনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।

মনুষ্যত্ব ও চরিত্র

শরৎ চন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল অপরিসীম। তিনি গল্প-উপন্যাসে পতিতা এবং পাপীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া অনেকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল যে, তিনি নিজেও ছিলেন চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। তাঁহার জীবিতাবস্থায় নিন্দুকেরা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কত যে অপবাদ রটনা করিয়াছিল, তাহার আর অন্ত নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ছেলেবেলা হইতে নিয়মশৃঙ্খলার নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ জীবনের উপর তাঁহার একটা গভীর বিরাগ ছিল এবং যৌবনে তিনি নানা প্রকার নেশার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে তাঁহার মনুষ্যত্ব এবং বিবেকবুদ্ধি লোপ পায় নাই, এ কথা অধিকাংশ লোকেই অবগত নহেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীর নিকট দীর্ঘকালের পানাভ্যাস পরিত্যাগের যে-ঘটনাটি তিনি বর্ণনা কারিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে তাঁহার দরদী কোমল অন্তঃকরণ এবং চরিত্রের দৃঢ়তা উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইবে—

একদিন অত্যন্ত দুর্য্যোগের মধ্যে সকাল বেলায় দাদার বাজে-শিবপুরের বাসাবাড়ীতে হাজির হইয়াছি।···

চা খাইতে খাইতে দাদা বলিলেন—শ্রীরামপুর থেকে যেদিন একটি মেয়ে এসেছিল, নাম···। অদ্ভুত মেয়ে—চেন কি?

—না, কি রকম অদ্ভুত মেয়ে?

—এসেই আমায় বল্‌লে কি না, 'অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করছি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আত্মীয় বন্ধু যাকেই বলি, সেই বলে—তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, তুমি যাবে শরৎ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে—তোমার সাহস ত কম নয়, তা আপনি কি এমনি যে কোনও যুবতী মেয়ে আপনার কাছে আসতে পারে না?'—শুনে বেশ কৌতুক বোধ হ'ল—বলিয়া দাদা হাসিতে লাগিলেন।

আমিও হাসিলাম। বলিলাম—আপনি কি জবাব দিলেন?

—হাঁ জবাব একটা দিলাম বই কি। বল্‌লাম—তাঁরা যদি দশ বছর আগেকার শরৎ বাবু সম্বন্ধে এ কথা বলে থাকেন ত আমি কিছু বল্‌তে চাই নে। কারণ তখন আমি দিন রাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতাম না; সর্ব্বদাই মদের নেশায় চুর। তবুও বল্‌তে পারি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও কখনও কোন নারীর অমর্য্যাদা আমি করি নি—আর এখন ত আমি তোমাদের বড়দা—নির্ভয়ে আস্‌বে

—খুব বুঝি মদ খেতেন দাদা?

—হাঁ ভাই। কিন্তু এক দিনে ছেড়ে দিলাম, অর্থাৎ মাতাল আর হই নি।

—কি ক'রে ছাড়লেন?

—আচ্ছা বল্‌ছি শোন। আর এক চাটুজ্জে ও আমি আর আমাদের একটি বর্ম্মী বন্ধু এক সঙ্গে মদ খেতাম, বর্ম্মী বন্ধুটির হঠাৎ হ'ল হার্টের অসুখ, ডাক্তার একেবারে মদ খাওয়া বন্ধ ক'রে

দিলেন। অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ী ব'সে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। একদিন—রাত্রি তখন ১১টা হবে, চাটুজ্জে এসে আমার দরজা ভাঙ্গতে লাগলো—'ও শরৎবাবু!' 'ও শরৎবাবু!' বুঝলাম দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, পিপাসা বেড়েছে, কিছু মদ চাই। আমার ঘরে যা ছিল তাতে পিপাসার শান্তি হ'ল না। আরও চাই—চাটুজ্জে বল্লে, চল বর্ম্মী বন্ধুর বাড়ী। প্রথমটা আমি রাজি হই নি, শেষে যেতেই হ'ল তার সঙ্গে। রাত্রি তখন ১টা হবে। অনেক ডাকাডাকির পর বন্ধু-গৃহিণী জানালা দিয়ে জানালেন—তাঁর স্বামী অসুস্থ, আমরা যেন দয়া ক'রে চলে যাই। ডাকহাঁকে বন্ধুটিও জেগেছিল, এসে তার স্ত্রীকে অনুরোধ করতে লাগলো—'দাও না খুলে, ঘরে ত একটা বোতল রয়েছে। ওরা খাক না—আমি ত আর খাচ্ছি না।'—আমার কতকটা জ্ঞান ছিল, ফিরে আসতে চাইলাম, কিন্তু চাটুজ্জে রাজি হ'ল না। একটা ছোট বেতের টেবিলের পাশে তিন জন পাশাপাশি বেতের চেয়ারে বসেছি, সামনে মেটিঙের উপর বন্ধু-পত্নী ব'সে স্বামীকে পাহারা দিচ্ছেন, আমরা মদ খাচ্ছি। বন্ধু-পত্নীটি দিনের শ্রমে বোধ হয় ক্লান্ত ছিল, ঝিমুতে লাগলো দেখে চাটুজ্জে বর্ম্মী বন্ধুটিকে ইসারায় এক পেগ নেবার অনুরোধ জানাল। আমি মানা করলাম, বর্ম্মী বন্ধুটিও পত্নীকে দেখিয়ে অস্বীকার করলো। আরও দু-একবার মদ খাবার পরে দেখা গেল বন্ধু-পত্নী মেটিঙের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। চাটুজ্জে আবার অনুরোধ জানাল—এবার সে আর অস্বীকার না ক'রে টেনে নিলে। দু-বারের পর তৃতীয় বারে নিজ হাতে পাত্র টেনে নিয়ে

এক চুমুকে যখন নিঃশেষ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আঁ—আঁ—একটা বিকট শব্দ ক'রে ঢলে পড়ল। ঐ শব্দে স্ত্রী ছেলেপিলে সকলের ঘুম ভেঙে গেছে, সকলেই তার বুকের উপর লুটোপুটি ক'রে এমনই কলরব তুললো, কোথায় গেল নেশা ছুটে। সেই রাত্রে থানা পুলিস ক'রে পরদিন তার শেষ গতি ক'রে বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা করলাম আর মাতাল হব না। চাটুজ্জেও প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু রক্ষা করতে পারে নি।—বল ত হরিদাস, একটি ভদ্রলোক—স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল, রাত একটায় দুটো মাতাল তাকে টেনে তুলে একেবারে মেরে এল! এর পরও যদি মাতালের বিবেক না আসে তবে আর কিসে আসবে?—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন। ('সাহানা,' ১৩৪৬)

শরৎ চন্দ্র ছিলেন নারীজাতির অকৃত্রিম দরদী বন্ধু। তাঁহার সাহিত্যে নারী-চরিত্রকে তিনি মহনীয় করিয়া আঁকিয়াছেন। শরৎ চন্দ্র পতিতাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে ইন্দ্রিয়-সম্পর্কে সংযত এবং তাহাদের দেহ-ভোগের লালসা হইতে মুক্ত ছিলেন, শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা পড়িলে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন—

অনেক ক্ষণ বাদে আমি বলিলাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো দাদা?

—কি বলো।

—অনেক লোকে আপনার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলে, সব দিকেই আপনি না কি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন!

দাদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—তোমার কি মনে হয় ?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কেন ?

—কারণটা ঠিক বলতে পারবো না, মন বিশ্বাস করতে চায় না।

—আমি বলি কারণটা আমায় ভালবাসো ব'লে তোমার মনের আদর্শ থেকে আমায় খাটো ক'রে দেখতে ইচ্ছা হয় না তোমার। কিন্তু কোন্ সাহসে তুমি আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করলে ? এমনও ত হ'তে পারে যে, আমার সম্বন্ধে লোকের যা কিছু ধারণা, সব সত্যি। আমার মুখের স্বীকারোক্তি শুনলে তোমার কিছু শাস্তি হবে কি ?

—না। কিন্তু আমার মন বলে সবই মিথ্যা। লোকে ঠিক কথা জানে না ব'লেই বলে।

দাদা চুপ করিয়া রহিলেন। কত ক্ষণ বাদে বলিলেন—দেখ হরিদাস, আমি সত্যই তোমায় ভালবাসি—তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। অন্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কোন জবাবই পেত না, তার কারণ সাধারণ লোকের ধারণায় কি আসে যায় ? আর সে ধারণা কত দিনের জন্যেই বা। একদিন আমি থাকবো না, তারাও থাকবে না, লোকে হয়ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ই জানতে চাইবে না। তখনও যদি আমার কোন লেখা বেঁচে থাকে, তা নিয়েই আমার বিচার করবে তারা, আমার

চরিত্র নিয়ে নয়। তবুও তোমার যখন জানতে ইচ্ছা হয়েছে, জানাব। বাস্তবিকই তাদের ধারণা মিথ্যা। অর্থাৎ নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোন কালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জান্‌তে পার তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদা ঠাকুর, কেউ বাবা ঠাকুর বল্‌তো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনও লালসা হয় নি, তার কারণ এ নয় যে আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারিনে, তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠে নি কখনও। আরও কিছু—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।

প্রশ্ন করলাম—আর কিছু, কি ?

—বিশ্বকবির গানটা তোমার মনে আছে কি ?

কখনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ স্মরি সরমেতে হই সারা।

প্রশ্ন করিলাম—তার মানে ?

—তার মানেও শুনতে চাও ? আচ্ছা শোনো। প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিষ্ফল হ'ল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে সে এসে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। সশরীরে যে নয় সে তোমায় বোঝাতে হবে না বোধ হয়।

—না। তার পর?

—তার পর—তার পরিচয় চাও ত? না, তা দেবো না। আজ শুধু আর একটি কথা তোমায় বল্‌বো—এ সব কথা নিয়ে তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করতে যেয়ো না—এইটিই আমার আদেশ রইলো তোমার উপর।

এমন লোক থাকা অসম্ভব নয় যিনি মনে করিবেন আমি গল্প লিখিতেছি। তাঁহাদের বলিতে চাই যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে—তা তাঁর প্রশংসারই হউক, নিন্দারই হউক—আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতাম না। তত্ত্বান্বেষীগণকে একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁরা জানেন নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল সর্ব্বদা জাগ্রত। নারীর কলঙ্ক সম্বন্ধে তিনি সাধারণতঃ বিশ্বাস করিতেন না।* এবং তাদের ভুলের জন্য সর্ব্বদাই তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেন।

রচনাবলী

শরৎ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন দিন দিন বাড়িতেছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি নানা ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রঙ্গালয় ও সিনেমাগুলিতেও তাঁহার গল্প-উপন্যাস নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

* "নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।"—'শ্রীকান্ত,' ১ম পর্ব।

শরৎ চন্দ্রের কোন্ রচনা কবে কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার নির্দেশসহ তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শরৎ চন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল আদৌ মুদ্রিত হয় নাই; অনেকগুলিতে কেবল সালের উল্লেখ আছে—মাসের উল্লেখ নাই। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম-নির্ণয়ে এই ইংরেজী তারিখগুলি অপরিহার্য।

১। **বড়দিদি** (উপন্যাস)। ১৩২০ সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ৭৯।

১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নাই।

'বড়দিদি'ই শরৎ চন্দ্রের মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম; ইহা প্রকাশ করেন—'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল।

২। **বিরাজ বৌ** (উপন্যাস)। ? (২ মে ১৯১৪)। পৃ. ১৭৫।

১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

৩। **বিন্দুর ছেলে** ও অন্যান্য গল্প। [শ্রাবণ ১৩২১] (৩ জুলাই ১৯১৪)। পৃ. ২১১।

ইহাতে "বিন্দুর ছেলে," "রামের সুমতি" ও "পথ-নির্দেশ"—এই তিনটি গল্প আছে। এগুলি প্রথমে 'যমুনা' পত্রিকায় যথাক্রমে

শ্রাবণ ১৩২০, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ ও বৈশাখ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রথম গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ "Bindu's Son" নামে 'মডার্ন রিভিয়ু' (ফেব্রুয়ারি-জুন ১৯২৭) পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। **পরিণীতা** (গল্প)। ইং ১৯১৪ (১০ আগস্ট)। পৃ. ১১৫।

১৩২০ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত।

৫। **পণ্ডিত মশাই** (উপন্যাস)। ১৩২১ সাল (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ ১৪৮।

১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

৬। **মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প**। [অগ্রহায়ণ ১৩২২] (১২ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ ১৭১।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে—"মেজদিদি", "দর্প-চূর্ণ" ও "আঁধারে আলো"। এগুলি প্রথমে ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' যথাক্রমে কার্তিক, মাঘ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে "দেওঘরের স্মৃতি" ('ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৪) গল্পটিও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৭। **পল্লী-সমাজ** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩২২ (১৫ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৮০।

১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকের ১৪শ সংস্করণটি সংশোধিত।

৮। **চন্দ্রনাথ** (উপন্যাস)। ? (১২ মার্চ ১৯১৬)। পৃ. ১৫৭।

১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত 'চন্দ্রনাথে'র ১৪শ সংস্করণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

"চন্দ্রনাথ গল্পটি আমার বাল্য রচনা। তখনকার দিনে গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনের যে-ভাষা ব্যবহার করা হইত এই বইখানিতে সেই ভাষাই ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম। ইতি ১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৪। গ্রন্থকার।"

৯। **বৈকুণ্ঠের উইল** (গল্প)। ১৩২৩ সাল (৫ জুন ১৯১৬)। পৃ. ১৩৮।

১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১০। **অরক্ষণীয়া** (গল্প)। কার্তিক ১৩২৩ (২০ নবেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৪।

১৩২৩ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১১। **শ্রীকান্ত**, ১ম পর্ব (উপন্যাস)। [মাঘ ১৩২৩] (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪৩।

১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী" নামে প্রথম প্রকাশিত।

ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—K. C. Sen ও Theodosia Thompson. ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ

(পৃ. ১৭৫) *Srikanta* নামে E. J. Thompson-এর ভূমিকাসহ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

১২। **দেবদাস** (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩২৪ (৩০ জুন ১৯১৭)। পৃ. ১৫৬।

১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৩। **নিষ্কৃতি** (গল্প)। ? (১ জুলাই ১৯১৭)। পৃ. ১২৫।

ইহার প্রথমাংশ "ঘর-ভাঙ্গা" নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'যমুনা'য় ও সমগ্র অংশ ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ সনের জুন মাসে শ্রীদিলীপকুমার রায় 'নিষ্কৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ *Deliverance* নামে (পৃ. ১৬+১০৪) প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদটি "Revised by Sri Aurobindo. With a Preface by Rabindranath Tagore."

১৪। **কাশীনাথ** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৪ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৯২।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। এগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশ-কালের নির্দেশ: ১। কাশীনাথ ('সাহিত্য,' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯); ২। আলো ও ছায়া ('যমুনা,' আষাঢ়, ভাদ্র ১৩২০); ৩। মন্দির ('কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন'); ৪। বোঝা ('যমুনা,' কার্তিক-পৌষ ১৩১৯); ৫। অনুপমার প্রেম ('সাহিত্য,' চৈত্র ১৩২০);

৬। বাল্য-স্মৃতি ('সাহিত্য,' মাঘ ১৩১৯) ; ৭। হরিচরণ ('সাহিত্য') আষাঢ় ১৩২১।

১৫। **চরিত্রহীন** (উপন্যাস)। ? (১১ নবেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ৫৬৬।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩৪৪ সালে মুদ্রিত ৫ম সংস্করণ 'চরিত্রহীনে'র জন্য গ্রন্থকারের এই ভূমিকাটি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু দপ্তরীর ভুলে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই ; ভূমিকাটি এইরূপ—

"চরিত্রহীনের গোড়ার অর্দ্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তার পরে ওটা ছিল প'ড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হ'ল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্ত্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্ত্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন ক'রে দিলাম। গ্রন্থকার। ১৪।৭।৩৭।"

১৬। **স্বামী** (গল্প)। ফাল্গুন ১৩২৪ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। পৃ. ৯১।

ইহাতে "স্বামী" ও "একাদশী বৈরাগী" নামে দুইটি গল্প আছে। প্রথমটি ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণে' এবং দ্বিতীয়টি ১৩২৪ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৭। **দত্তা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৫ (২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ২৬৭।

১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৮। **শ্রীকান্ত,** ২য় পর্ব (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ১৯২।

১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৯। **শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী** ১-৭ খণ্ড। ইং ১৯১৯-৩৫। (বসুমতী)

১ম খণ্ড (২০-১০-১৯): দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল।

২য় খণ্ড (২০-১-২০): শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব, দেবদাস, দর্পচূর্ণ, পল্লী-সমাজ, বড়দিদি।

৩য় খণ্ড (১৮-৬-২০): স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিত মশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি।

৪র্থ খণ্ড (২৫-৯-২০): চরিত্রহীন, ছবি, বিলাসী।

৫ম খণ্ড (২১-২-২৩): গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ।

৬ষ্ঠ খণ্ড (২৫-৯-৩৪): শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব, নব-বিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ।

৭ম খণ্ড (১৭-৯-৩৫): শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

২০। **ছবি** (গল্প-সমষ্টি)। মাঘ ১৩২৬ (১৬ জানুয়ারি ১৯২০) পৃ. ১০৪।

সূচী :—"ছবি" (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ১৩২৬ সালের পূজা-বার্ষিকী 'আগমনী'), "বিলাসী" ('ভারতী,' বৈশাখ ১৩২৫) ও "মামলার ফল" (১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত বার্ষিকী 'পার্ব্বণী')।

২১। **গৃহদাহ** (উপন্যাস)। ? (২০ মার্চ ১৯২০)। পৃ. ৫৩২।

১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র ; ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ; ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র ; ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

২২। **বামুনের মেয়ে** (উপন্যাস)। ? [আশ্বিন ১৩২৭]।

ইহা শিশির পাবলিশিং হাউস-প্রবর্তিত "উপন্যাস সিরিজ"-এর ২য় বর্ষের প্রথম উপন্যাস (নং ১৩)—দ্র° ১৩২৭ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপন।

২৩। **নারীর মূল্য** (সন্দর্ভ)। ? (১২ এপ্রিল ১৯২৩)। পৃ. ১৩৩।

ইহা শরৎ চন্দ্রের বড় দিদি "শ্রীমতী অনিলা দেবী"র ছদ্ম নামে ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকে "প্রকাশকের নিবেদন"টি উদ্ধৃত করিতেছি ; উহা শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার-স্বাক্ষরিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে শরৎ চন্দ্রেরই রচনা :—

"১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিকপত্রে নারীর মূল্য প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

"কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে তিনিই জানেন, তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এম্‌নি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তার পরে, এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোন মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক্, পারেন ত আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি,—তিনি বলেন, না হে, থাক্, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এম্‌নি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। অথচ, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও নয়,—আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইঁহাদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে, এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি,

তাহা পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের ত মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

২৪। **দেনা-পাওনা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩০ (১৪ আগস্ট ১৯২৩)। পৃ. ৩০৭।

ইহা ১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র, ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র; ১২২৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২৫। **নব-বিধান** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩১ (অক্টোবর ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬।

১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

২৬। **হরিলক্ষ্মী** (গল্প-সমষ্টি)। ? (১৩ মার্চ ১৯২৬)। পৃ. ৯২।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে,—হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ। প্রথম গল্পটি ১৩৩২ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পটি যথাক্রমে ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী'র আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২৭। **পথের দাবী** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৩ (৩১ আগস্ট ১৯২৬)। পৃ. ৪২৬।

ইহা ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন; ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-

কার্তিক, পৌষ-মাঘ; ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক-ফাল্গুন; ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে সমগ্রভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

"১৩৩৩ সনে ইহার ১ম সংস্করণ বাহির হইলে গবর্ণমেন্ট এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"...(২য় সংস্করণ)

২৮। **শ্রীকান্ত**, ৩য় পর্ব (উপন্যাস)। [চৈত্র ১৩৩৩] (১৮ এপ্রিল ১৯২৭)। পৃ. ২১৩।

১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে প্রথম প্রকাশিত।

২৯। **ষোড়শী** ('দেনা-পাওনা'র নাট্য-রূপ)। ? (১৩ আগস্ট ১৯২৭)। পৃ. ১৫৩।

৩০। **রমা** ('পল্লী-সমাজে'র নাট্য-রূপ)। ? (৪ আগস্ট ১৯২৮)। পৃ. ১৪৪।

৩১। **তরুণের বিদ্রোহ** (সন্দর্ভ)। ইং ১৯২৯ (১৮ এপ্রিল)। পৃ. ২৩।

"১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।"

সরস্বতী লাইব্রেরি কর্তৃক এই পুস্তকখানি প্রচারের তিন বৎসর পরে আর্য পাবলিশিং কোং ইহার পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ প্রচার

করেন (২৩ আগস্ট ১৯৩২) এই সংস্করণে "তরুণের বিদ্রোহ" ছাড়া ১৩২৮ সালের ২০এ মাঘ ও ৫ই ফাল্গুন তারিখের 'বাংলার কথা' এবং ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত "সত্য ও মিথ্যা" প্রবন্ধটিও স্থান পাইয়াছে।

৩২। **শেষ প্রশ্ন** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩৩৮ (২ মে ১৯৩১)। পৃ. ৪০০।

ইহা 'ভারতবর্ষে'র ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র ; ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন ; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র ; ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু "ভারতবর্ষে প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকে মুদ্রিত উপন্যাসের যে সর্ব্বত্র মিল নাই, এ কথা বলা প্রয়োজন।"

৩৩। **স্বদেশ ও সাহিত্য** (সন্দর্ভ-সমষ্টি)। ভাদ্র ১৩৩৯ (ইং ১৯৩২)। পৃ. ১৫৬।

আর্য পাবলিশিং কোম্পানি এই পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশ করেন।

স্বদেশ :—আমার কথা (১৯২২ সালের ১৪ জুলাই হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণ) —'প্রবর্তক,' শ্রাবণ ১৩২৯। স্বরাজ সাধনায় নারী (১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইনষ্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ)—'বাংলার কথা' (সাপ্তাহিক) ২৯ পৌষ ১৩২৮ ; 'নব্যভারত,' পৌষ ১৩২৮। শিক্ষার বিরোধ (১৩২৮ সালে "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে"

পঠিত)—'বাংলার কথা' ১৪ই, ২১এ আশ্বিন ১৩২৮; 'নারায়ণ,' অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮। স্মৃতিকথা (১৩৩২ আষাঢ় "দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা," 'মাসিক বসুমতী' হইতে গৃহীত)। অভিনন্দন (১৩২৮ সালের জুন মাসে, স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে পঠিত অভিনন্দন)।

সাহিত্য :—ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য (১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)। গুরু-শিষ্য সম্বাদ ('যমুনা,' ১৩২০ ফাল্গুন ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে গৃহীত)। সাহিত্য ও নীতি (১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ)—'বঙ্গবাণী,' পৌষ ১৩৩১। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির অভিভাষণ) —'মাসিক বসুমতী,' চৈত্র ১৩৩১। ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত ('ভারতবর্ষ' ১৩৩১ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে গৃহীত)। আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ (১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে, সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ)—'বঙ্গবাণী,' শ্রাবণ ১৩৩০। সাহিত্যের রীতি ও নীতি ('বঙ্গবাণী,' ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা হইতে গৃহীত)। অভিভাষণ (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর)— 'কালি-কলম,' আশ্বিন ১৩৩৫। অভিভাষণ (৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি-প্রদত্ত

অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত)—'বাতায়ন,' ২৯ আশ্বিন ১৩৩৮। যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা। শেষ প্রশ্ন (সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী…সেনকে লিখিত পত্র, 'বিজলী,' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা হইতে গৃহীত)। রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত)—'জয়ন্তী-উৎসর্গ,' পৌষ ১৩৩৮।

৩৪। **শ্রীকান্ত,** ৪র্থ পর্ব্ব (উপন্যাস)। ? (১৩ মার্চ ১৯৩৩)। পৃ. ২৪৬।

১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত।

৩৫। **অনুরাধা-সতী ও পরেশ** (গল্প-সমষ্টি)। ? [ফাল্গুন ১৩৪০] (১৮ মার্চ ১৯৩৪)। পৃ. ১২৩।

"অনুরাধা" ১৩৪০ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে,' "সতী" ১৩৩৪ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে এবং "পরেশ" ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'শরতের ফুলে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৩৬। **বিরাজ বৌ** (নাট্য-রূপ)। ? (১৮ আগস্ট ১৯৩৪)। পৃ. ১১৪।

৩৭। **বিজয়া** ('দত্তা'র নাট্য-রূপ)। ? (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। পৃ. ১৭২।

৩৮। **বিপ্রদাস** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৪১ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। পৃ. ৩২৩।

ইহা ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন; ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্তিক-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের পূর্বে "বিপ্রদাস" ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৩য়-৫ম বর্ষের (১৩৩৬-৩৮) 'বেণু'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৩৯। **শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ**। চৈত্র ১৩৪৪। পৃ. ৩০।

শ্রীহর্ষ-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমুরারি দে-সম্পাদিত। "বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র ছাত্রগণের অনুরোধে বিভিন্ন কলেজে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি একত্রিত ক'রে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হ'ল।"

সূচী :—(১) পৌষ ১৩২৮ সাল শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট পঠিত। (২) ৫৩তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৫ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা। (৩) ৫৪তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৬ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা। (৪) ৫৫তম [বার্ষিক] জন্মদিবসে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত। (৫) আশুতোষ কলেজ বাংলা সাহিত্য-সম্মেলন দ্বিতীয় বার্ষিক (২১ ফাল্গুন ১৩৪২) উৎসবে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা। (৬) স্কটিশ চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত ৬২তম জন্মদিনে ৩১ ভাদ্র ১৩৪৪ "বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি"-প্রদত্ত

অভিনন্দনের উত্তরে মৌখিক বক্তৃতা। (৭) ৬২তম জন্মদিবসে (৩১ ভাদ্র ১৩৪৪) বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত অভিনন্দন-সভায় প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা।

৪০। **ছেলেবেলার গল্প** (সচিত্র)। ? [বৈশাখ ১৩৪৫; ইং এপ্রিল ১৯৩৮]। পৃ. ১২১।

সাতটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলির নাম:—১। লালু ('মৌচাক,' চৈত্র ১৩৪৪); ২। ছেলেধরা (ব্রজমোহন দাশ-সম্পাদিত (পূজা-বার্ষিকী 'ছোটদের আহরিকা,' ১৩৪২); ৩। কোলকাতার নতুন-দা (শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা,' ১৩৪৪); ৪। লালু (শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'সোনার কাঠি,' ১৩৩৪); ৫। বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী ('পাঠশালা,' আশ্বিন-কার্তিক ১৩৪৪); ৬। লালু; ৭। দেওঘরের স্মৃতি ('ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৪)।

৪১। **শুভদা** (উপন্যাস)। ? (৫ জুন ১৯৩৮)। পৃ. ২৫৪।

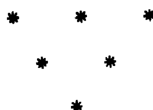
৪২। **শেষের পরিচয়** (উপন্যাস)। ? (৭ জুন ১৯৩৯)। পৃ. ৪১৪।

ইহার ১৫ পরিচ্ছেদ ("রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।" পর্যন্ত) প্রথমে 'ভারতবর্ষে' (১৩৩৯, আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৪০, বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ; ১৩৪১, আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্তিক, ফাল্গুন; ১৩৪২ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের বাকী অংশ শ্রীরাধারাণী দেবীর রচিত।

৪৩। **শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী**। ফাল্গুন ১৩৫৪ (ইং ১৯৪৮)। পৃ. ১৯০।

৪৪। **শরৎচন্দ্রের রচনাবলী**। শ্রাবণ ১৩৫৮ (ইং ১৯৫১)। পৃ. ৩৭৯।

সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত শরৎ চন্দ্রের রচনাবলী-সংগ্রহ।



শরৎ চন্দ্র তিনখানি বারোয়ারি উপন্যাসেরও অন্যতম লেখক ছিলেন; এগুলি—

(১) 'বারোয়ারি উপন্যাস': ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, প্রকাশকাল মে ১৯২১। ইহার ২১শ-২২শ অধ্যায় শরৎ চন্দ্রের লিখিত।

(২) 'রসচক্র': প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬)। ইহার ৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তি পর্য্যন্ত শরৎ চন্দ্রের রচনা। এই সূচনা-ভাগ 'রসচক্র' নামে ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'উত্তরা'য় প্রকাশিত হয়; প্রকৃতপক্ষে এই অংশ প্রথমে কাশী হইতে প্রকাশিত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' পত্রের প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩২৭) "বাড়ীর কর্ত্তা" নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

(৩) 'ভালোমন্দ': ১৩৪৪ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখের 'বাতায়নে' শরৎ চন্দ্র ইহার সূচনা করেন। ইহা এখনও সম্ভবতঃ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

এই বারোয়ারি উপন্যাসগুলির শরৎ চন্দ্র-লিখিত অংশ 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী' (৪৪ সংখ্যক) গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

পত্রাবলী

আমরা শরৎ চন্দ্রের লিখিত বহু মূল্যবান্ পত্র সংগ্রহ করিয়া 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী'* নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। ইহা প্রকাশিত হইবার পর আরও যে-সকল পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কেবল মাত্র সেইগুলিই বর্ত্তমান পুস্তকে মুদ্রিত হইল।

---

* এই পুস্তকের কয়েকটি ত্রুটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাঁহারা এগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন :—

পৃ ৫৪ : 'প্রবাহ' হইতে উদ্ধৃত পত্রখানি শ্রীসুবোধ রায়কে লিখিত।

পৃ. ১৮১ : কেদারনাথকে লিখিত পত্রখানির খামের উপর এই অংশটুকু ছিল :— "অন্নপূর্ণা ও ধন্যা পড়লাম। বেশ লাগ্‌লো। মন খুশী হল। কিন্তু ঠাকুর-দেবতার বিশ্বাসটা একটু যেন বেশী দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। শেষে রবীন্দ্রনাথের দশায় না দাঁড়ায়। শুনেছি homeopathyতে এর না কি ভালো ওষুধ আছে। ওখানে ভালো হোমিওপ্যাথ যদি থাকে একবার consult করলে মন্দ হ'ত না। শঃ"

[প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত]

১

D. A. G.'s Office, Rangoon
11. 3. 12.

প্রমথকে জানাইতেছি যে আমি ও দেশে মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও যাইবার আশা রাখি। আমি যখন যাই অন্ততঃ শেষ দু-বারের মধ্যে চেষ্টা করিয়াও প্রমথর ঠিকানা না জানায় দেখা করিতে পারি নাই।

আমি নিজেও ভাল নই। কেন না বছর দুই আগে হৃদ্‌রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছি, আজো সম্ভবতঃ আরোগ্য হই নাই, তবে যন্ত্রণাটা কমিয়াছে।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারির রাতে আমার বাড়ী ঘর দোর সব জ্বলিয়া গিয়া একটু মুস্কিলে পড়িয়াছি। হাজার দুই টাকার জিনিসপত্র ত গিয়াছেই তা ছাড়া একটা দামী লাইব্রেরী ছিল—manuscript প্রভৃতি সবই গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম এই মে মাসের শেষেই একটা কিছু প্রেসে পাঠাইয়া দিব। কাহার উপরে ভার দিব ভাবিতেই অনেক বার প্রমথর কথা মনে হইয়াছে কিন্তু এটা মনে করি নাই যে সে আজো সম্ভবতঃ কলিকাতাতেই আছে। আশা করি খবর সব ভালই।—শরৎ

মে মাসের মধ্যে আবার কলিকাতায় যাইব।

২

D. A. G.'s Office, Rangoon
22 3. 12.

প্রমথ—তোমাব পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে, তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশী জবাবদিহি করা বাহুল্য।

অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে তাহা আমি জানি। কেন না, যাদেব মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি ত করিবেই!

আমাব ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমাব কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম! তা হইবার নয়। আমাকে ইঁহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন, এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন। লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। এত কথা বলিতাম না যদি তুমি গত কথা না স্মরণ করাইয়া দিতে। আমি মরিয়া গিয়াছি—এই কথাটা যদি কোনো দিন কাহারো দেখা পাও—বলিয়ো।

তাই বলিয়া তুমি যেন দুঃখ পাইয়ো না। তোমাকে আমি ভয় করি না। কেন না, তুমি বোধ হয় আমার বিচার করিবার গুরু ভার লইতে চাহিবে না। তাই তোমার কাছে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে মনে করি না। তুমি আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। বিচারক হইয়া আমার মর্ম্মান্তিক [?] করিবে না এই আশাই তোমার কাছে করি।

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ—তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরে একখানা ছোটো বাড়ীতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকৃরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনোমতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript—"নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তা'ও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসর publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয় তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব, এমন উৎসাহ

পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।

তোমার ক্লাবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। কিরূপ হয় মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইয়ো। নিজেও কিছু করা ভাল—হুজুগের মধ্যে এ কথাটাও ভোলা উচিত নয়। তোমার যে রকম স্বভাব তাহাতে তুমি যে এতগুলি লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়িবে তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য সভা'র একটি মাত্র সভ্য 'নিরুপমা দেবীই' সাহিত্যের চর্চ্চা রাখিয়াছেন—আর সকলেই ছাড়িয়াছে—এই না?

আমার আগেকার কোনো লেখা আমার কাছে নাই—কোথায় আছে, আছে কি না-আছে কিছুই জানি না—জানিতে ইচ্ছাও করি না।

আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart disease-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil painting স্থরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি কবা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি।

(1) Novel, History, Painting

কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার স্থরু করি বল ত।

তোমার স্নেহের শরৎ

৩

D. A. G.'s Office, Rangoon.
29. 4. 12.

প্রমথ,—আমি মনে ক'রে আছি তুমি চিঠি লেখ না কেন—এ দিকে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা' আমার বাক্সেটেই পড়েছিল। মনে জানি নিশ্চয়ই পোষ্ট করা হয়ে গেছে।—এ রকম ভুল হওয়ায় বড়ই লজ্জিত হয়ে আছি যাহোক এ বারের মত বেশী কিছু মনে কোরো না এই অনুরোধ করি।

আমার Habit প্রভৃতি তুমি অপরের কাছে সন্ধান লইতে গেলে কেন? জিজ্ঞাসা করলে আমি কি বলতাম না মনে কর? অবশ্য তুমি আমার বর্ত্তমান মনের ও শারীরিক অবস্থা জান না—দেখ্‌লে বুঝতে পারবে—মিথ্যা কথা ব'লে কাজ বাড়াবার মত সময় আমার একেবারে নাই।

এ চিঠিতে বেশী কিছু লিখ্‌ব না শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে আমি মে মাসেই যাব—কবে, কি বৃত্তান্ত বল্‌তে চাই নে। আমাকে সশরীরে দেখলেই টের পাবে আমি এসেছি।—

এক রকম শরীরের স্বস্তি নাই তার ওপরেও ক'দিন থেকে আরো যেন অসুখ করেছে—

শীঘ্র জবাব দিও কাজ আছে।—শরৎ

৪

[৪ এপ্রিল ১৯১৩]

প্রমথ, তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম, তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস—আমি এ

কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি। আমি ত যোগ্য নই ভাই! আমার অনেক দোষ। তোমার সরল, স্নেহপূর্ণ বন্ধুত্ব আমাকে অনেক সময়ে সুখ দেয়—দুঃখ দিতেও ছাড়ে না। ভাবি, আমার সম্বন্ধে এই লোকটা ইচ্ছা ক'রেই আত্মপ্রবঞ্চনা করছে—না, সত্যি এত সরল সুহৃৎ আজ কাল মেলে? তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, এ কথা কেউ যদি না বিশ্বাস করে প্রমথ, তুমি করবেই। আমার অনেক দোষের সময়েও যখন বিশ্বাস ক'রে এসেছ, তখন, এখন ত আমি ভাল ছেলের মধ্যেই। আজকাল প্রায়ই সত্যি কথা বলি।

আমার অনেক কথা আছে। আমার 'কাশীনাথ'টা অতি ছেলেবেলাকার লেখা। যে সময়ে ওটা তোমারও ভাল লাগত (মনে আছে বোধ হয়—পাথুরেঘাটায়), আমারও ভাল লেগেছিল লিখেওছিলাম। আজ তুমিও বড় হয়েছ আমিও। তোমারও ভাল লাগে নি, আমার ত অতি বিশ্রী লেগেছে। ধন্য সমাজপতি মহাশয়! এও প্রকাশ করেছেন!

অনিলা দেবী ও তাঁর ভাই শরৎ—অর্থাৎ শরৎ এবং অনিলা দেবী—অর্থাৎ অনিলা দেবী এবং শরৎ 'যমুনা' কাগজে কথা দিয়ে নিজের হাত পা বেঁধেছেন। আমি অনেক অপরাধ অনেক গর্হিত কায আমার প্রথম বয়সে করেছি—আব করতে চাই নে ভাই! আমি কথা দিয়েছি—তুমি আমার বন্ধু—এতে প্রফুল্লমনে সম্মতি দাও। লোভের বশে, বা তোমার মত বন্ধুর অনুরোধেও আর অসত্য সৃষ্টি না করি এই আশীর্ব্বাদ ক'রে আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভিক্ষা দাও। আমার মামারাও বিরূপ—তাঁদেরও অনেক অনুনয় করেছি। আমার লেখা, (ছোট গল্পে যদিও তেমন

মজবুত নই) ফাল্গুন থেকে যমুনায় বেরোচ্ছে এবং তোমার অনুমতি পেলে আরও কিছু কাল নিশ্চয়ই বেরোবে। আমার মত্ এবং গল্পের ধারা সম্বন্ধে বিচার করবার জন্য দুই এক দিনের মধ্যেই যমুনা পাবে। যমুনা দেখে সমুদ্রের ধারণা তোমার না করতেও হয়ত হ'তে পারে। যমুনা দেখে যমুনার ধারণাই কোরো—তোমার স্বাধীন মত লিখে জানাইয়ো। বৈশাখও প্রথম বৈশাখেই পাবে। তাতে নারীর মূল্য ব'লে ক্রমশঃ একটা প্রবন্ধ অনিলা দেবী লিখছেন। তাব সম্বন্ধেও মত দেবে।

'চরিত্রহীন' তোমাকে পড়তে দিতে পারি কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে—তা ছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে। আমার সম্বন্ধে (অবশ্য আমার recent লেখা প্রভৃতি আলোচনার পরে) যদি ভাল opinion হয় এবং আমার লেখা চাও নিশ্চয়ই দেবো—কিন্তু, এখন নয়। নিঃশব্দে গোপনে—ঢাক ঢোল পিটে ফটোগ্রাফ দিয়ে নয়। আমি অত অর্ব্বাচীন নই। আরও একটা কথা এই যে, চরিত্রহীন গল্প হিসাবে—তা' সে প্রায় কিছুই নয়। অ্যানালিসিস্ —Psychological—এই ইচ্ছা নিয়েই লিখি। সেটা পুড়ে যায় তার পরে দুটো মিশিয়ে একরকম ক'রে লিখেছি।

আজ এই পর্য্যন্ত। বাড়ীর খবর ভাল ত? আমার কথাটা বাড়ীর মধ্যে একবার জানিয়ে দিয়ো। তোমার পিসীমাকে প্রণাম জানালাম।

তোমার স্নেহের শরৎ

প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব—মাপ করবে? যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল Novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ

লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য ব'লে মনে হবে —সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ করো। তার পূর্ব্বে নয়—এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি কারও কাছে অসত্য খাতির চাই না—আমি সত্য চাই। তোমাদের কাগজে ভাল লেখার অভাব হবে না; কেন না, তোমরা টাকা দেবে। কিন্তু, আমি যদি এই সময়েই 'যমুনা'কে ছাড়ি, তার আর কেউ থাকবে না। অথচ, আমি বলেছি, যদি meritএর আদর থাকে—তবে যমুনা বড় হবেই। আমি কোনদিন কোন কাজেই এলাম না ভাই, যদি এই একটা কাজ সম্পন্ন ক'রে তুলতে পারি, তবুও একটু সুখে মরব। এর মধ্যে আমাকে জবাব দেবার প্রয়োজন নাই। একেবারে বৈশাখের যমুনা দেখে তোমার স্বাধীন মত দিয়ে চিঠি লিখো। দিদির নারীর লেখাটা সম্বন্ধে বোধ করি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু Truth চাইই। আজকালকার দিনে এইটারই সবচেয়ে প্রয়োজন। আমি নির্ভীক লোক— খাতির ক'রে কথা বলতে জানি না—তাই আমি নিজের ওপর এই ভারটা নিয়েছি ঠিক এই ধরণের বারটা প্রবন্ধ লিখব যথা— (১) নারীর মূল্য (২) ধর্ম্মের মূল্য (৩) ঈশ্বরের মূল্য (৪) নেশার মূল্য (৫) মিথ্যার মূল্য (৬) আত্মার মূল্য (৭) পুরুষের মূল্য (৮) সাহিত্যের মূল্য (৯) সমাজের মূল্য (১০) অধর্ম্মের মূল্য (১১)...... (১২)......

বোধ করি বছর দুই লাগবে শেষ করতে। মত কি? ভাল হবে? দ্বাদশ মূল্য নাম দেব মনে করছি। তোমার লেখার কি হ'ল? বলেছিলে পাঠাবে? যদি পাঠাও 'registered' পাঠাবে।

৫

১৭ই এপ্রিল ১৯১৩

রেঙ্গুন

প্রমথ, তোমার কাল পত্র পাইয়াছি আজ জবাব দিতেছি। সময় নাই কাজের কথা বলি। বৈশাখের যমুনায় ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে চরিত্রহীন শ্রাবণ হইতে তাহারাই বাহির করিবে। এ অবস্থায় আমার আর কি বলিবার আছে জানি না। কেন যে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসবাবুকে এ প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা নিশ্চয়ই বুঝি। তুমি জানিতে অসাধ্য না হইলে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকিতে পারে না। এখন এই বিভ্রাট যে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব স্থির করা যথার্থই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যে আমার জন্য লজ্জা পাইবে (false position)এ পড়িবে এইটাই আমাকে দ্বিধায় ফেলিযাছে—না হইলে আমি কোন কথাই মনে করিতাম না। যমুনায় ছাপা উচিত কি না এ কথাই উঠিতে পারিত না। এখন, তোমার সম্মান অসম্মানের কথা—এইটাই আসল কথা। জলধরবাবু প্রভৃতি নামজাদা লেখক—তাহাদের জোর করিয়া পয়সার লোভে লেখা উপন্যাস অবশ্য ভাল হইতেই পারে না কিন্তু, তবু নাম আছে—সেগুলো ফিরাইয়া দিয়া ভাল কর নাই। অথচ, আমারটা যে তোমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে এরই বা স্থির কি? যাই হোক তোমাকে অন্তত: পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীনে'র যতটা লিখিয়াছিলাম—(আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনরূপ বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে।

তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—কেন না তাঁহাব সত্যই ভাল লাগিয়াছে। তোমাদের জলধর সেন প্রভৃতির লেখাই বেশ হইবে। আমার এ সব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে! তবে, তোমার উপর আমার এই শপথ রহিল যদি বাস্তবিকই আর দ্বিতীয় উপায় না থাকে তা হলে আর কি বলিব অন্যথা আমাকে ছাড়িয়া দিয়ো—যমুনার কলেবরই ইহাতে বৃদ্ধি করিব। তার চেয়েও আর একটা বড় কথা আছে। তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত তাহলে হয়ত ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা কবিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা মত করিবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা কিছুতেই হইতে পাবিবে না উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে, একটা কথা বলি—শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া চবিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethicsএর student—সত্য student. Ethics বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাই হৌক পড়িয়া ফিরিয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো।

তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়। ষাঁড়ের বাড়ীর গল্পও নয়। যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিবে আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই—আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য ক'রে লিখি—এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের যমুনা কেমন লাগল? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো—

শরৎ

৬

[মে ১৯১৩ ?]

প্রমথ, তুমি যতক্ষণ না আমার লেখা পড়, ততক্ষণ আমার লেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটা সম্ভবতঃ ছেলেবেলার অভ্যাস। এই জন্যই 'যমুনা' যাতে তোমার কাছে যায়, সে ব্যবস্থা আমাকে নিজেই করতে হয়েছে। আমার স্বভাব জানই ত। যারা আপনার লোক তারা যে আমাকে ঠিক জানতে পারে, অথচ, পরে আমার কিছুই না জানে এই যে আমার স্বাভাবিক ব্যাধি—এর অনুরোধেই তোমাকে যমুনা পাঠানো এবং এর জন্যই তোমার কাছে 'চরিত্রহীন' পাঠালাম। আশা করি এত দিনে পেয়েছ। কি জানি আমার মনে একটা ভয় হয়েছে এই বইটা ভাল লাগবার সাহস তোমার নাই Intellectually এ একেবারে নির্দ্দোষ না হলেও নেহাৎ নীচু নয়—।

কিন্তু 'রুচি'র কথ তুল্‌লে গোড়াটায় এর দোষ কিছু বেশী। অথচ, সব বুঝেও আমি এর এক ছত্রও বাদ দিই নি—দিবও না। যাক্ এ কথা। তোমাকে পড়তে দিয়েছি তোমার honest opinion দিয়ে ফিরিয়ে দেবে আশা করি—অনুরোধ করি। তোমরা reject কর—আমার এই (ঈশ্বরের কাছে) আন্তরিক প্রার্থনা। কারণ, তোমাকে তাহলে আর false positionএ পড়তে হবে না। সহজেই বলতে পারবে—এ পছন্দ হয় নি। একবার মনে করেছিলাম, প্রমথ, তোমাদের কাগজের জন্য কিছু ছোট গল্প সাধ্যমত ভাল ক'রে লিখব—কেন না, তুমি এ কাগজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু, হঠাৎ সে আশাও ছাড়লাম। এর সঙ্গে যে চিঠি পাঠালাম (ফণীবাবুর—যমুনা সম্পাদকের) তা থেকেই সব বুঝবে—এবং হরিদাসবাবুর আপনার লোকে যখন এরি মধ্যে আমার নামে এত মিথ্যা আমারি বন্ধুদের কাছে বলেছে, তখন ভবিষ্যতে (যদি তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি) আরো যে কত মিথ্যা কুৎসা রটবে তা ত তুমিই বুঝতে পাচ্ছ। আমার নিন্দায় আমার চেয়ে তুমি নিজে বেশী কষ্ট পাবে তা' আমি বেশ জানি, কিন্তু, পাছে হরিদাসের প্রতি স্নেহ তোমাকে আমার দিকে অন্ধ ক'রে ফেলে তাই এত কথা লিখলাম—না হ'লে শুধু ফণীর চিঠিটা পাঠিয়েই তোমার সৎ বিবেচনার উপর বরাত দিয়েই চুপ ক'রে থাকতাম। যা' আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি (বড় লোকের নির্লজ্জ খোসামোদ) তাই কি প্রকারান্তরে আমার ভাগ্যে ঘটবে যদি তোমাদের সঙ্গে 'সাহিত্যিক' সম্বন্ধ রাখি? তোমরা টাকা দেবে, তোমাদের influence ছোট সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রচুর—কিন্তু

আমি ছোট সাহিত্যসেবীও নয় এবং টাকার কাঙালও নয়। অন্ততঃ আত্মসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে নয়। একা তুমি এবং তোমার ভালবাসা ছাড়া আমাকে কিনতে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই, ত' তোমাদের পাড়াটি ত ছোট। কি দুঃখ হয় বল ত? হরিদাস বাবুর manager সু— তাকে আমিও চিনি—আমার সম্বন্ধে এত মিথ্যা রটাতে তার একটু সঙ্কোচ বোধও হ'ল না? তারা মনে করে আমি তাদেরি মত হীন, নীচ, ব্যবসাদার সাহিত্যসেবীর মুখ ভ্যাংচানি—না? প্রমথ, বেশী গর্ব্ব করা ভাল নয়, আমি কি তা' আমি জানি। আমি যে কোন কাগজকে আশ্রয় দিয়েই তাকে বড় করতে পারি—এ যদি তোমার মিথ্যা কথা ব'লে মনে হয়, বেশী দিন নয়—একটা বৎসর দেখো—তার পরে বলবে শরৎ কেবল জাঁকই করে না। যাক এ সব আমাদের আপোষের কথা এ নিয়ে কারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—কিন্তু, যদি তোমার ওঁদের ওপর এতটুকুও influence থাকে, আর যদি আমি তোমার শত্রু না হই, ত' এ সব মিথ্যা যাতে আর না রটে তা' কোরো ভাই। আমি ঝুড়ি ঝুড়ি লিখতেও পারি নে—লিখলেও ছাপাবার জন্যে ভদ্রলোককে চিঠি লিখে লিখে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলি নে। ফণী আমাকে কিছুতেই একটি কথাও মিথ্যা বলবে না এ আমি নিশ্চয় জানি। তাছাড়া আমিও ঐ হতভাগা বাগচীকে জানি অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে শুনেছি। তাই এত দুঃখ হয়েছে, যে তোমাকেও এ সব রূঢ় কথা লিখতে বাধ্য হ'তে হ'ল।

প্রমথ, আমি 'যমুনা'কে ভালবাসি সে কথা তোমার অগোচর নাই, তবুও পাছে তোমাকে অমর্য্যাদা করা হয়, এই ভয়েই তোমাকে

'চরিত্রহীন' পাঠিয়েছি। (তুমি ভাল-মন্দ কি বল, না-বল সেটাও আর একটা কথা) যদি একেবারেই না পাঠাই, তোমাদের দলের লোকের মনে হ'তে পারে, আমি তোমাকে ঠিক অত বেশী ভালবাসি না। কিন্তু ভাল যে বাসি এইটা সপ্রমাণ করবার জন্যেই তোমাকে পাঠানো। তুমি পড়বে এবং reject করবে। ক্ষতি নাই, তবু তোমার মান থাকবে এবং আমার ওপরে যে তোমার জোর আছে সেটাও জানা যাবে। তোমার চিঠি পেলে আমি ফণী পালকে লিখে দেব। সে তোমার কাছ থেকে ওটা নিয়ে আসবে।

আর একটা কথা বলি প্রমথ, টাকার গর্ব্বটাই তোমাদের দলের লোকের মনে যেন খুব বেশী না থাকে। **টাকা সবাইকে কিনতে পারে না**। একটু সৎ, একটু honest হওয়া চাই। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? এখনও কাগজের অনুষ্ঠান-পত্র বার হ'ল না, এর মধ্যেই এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা গ্লানি? তোমরা পরে যে কি করবে আমি তাই ভাবছি। সমাজ যাতে ভাল হয়, লোক যাতে সৎ শিক্ষা পায়, মাসিক কাগজের সে একটা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া চাই। অথচ, এমনি তোমাদের manager যে—তাঁর কথা আর বেশী তুলতেও রাগ হচ্ছে। টাকা খরচ ক'রে, মাইনে দিয়ে কি এই লোক রাখে? এই সব নমুনা যাতে বেশী প্রশ্রয় না পায়, হরিদাস বাবুকে আমার সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে বলবে। বলবে—আমার পেশা চাক্‌রি—তাতে দু-মুটো খেতে পাই। আমি সন্ন্যাসী—আমার নামের ওপর টাকার ওপর আত্মসম্মানের চেয়ে বেশী লোভ নেই। তাছাড়া, আমি ত' হরিদাস বাবুর কোন অন্যায় করি নি, যে, তাঁর "ডান-হাত"

আমার 'ডান-হাত'টা কাটবার চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার অভিমান বড় কম নয়। কিছু কম হ'লে আর এমন নির্ব্বাসনে এত অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারতাম না।

যাই হোক—তুমি আমার বন্ধু। বন্ধু বললে যা মানে হয় তাই। তার এক তিল কম নয়। যা উচিত তুমি করবে।

'পথনির্দ্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা? না পড়লেও ক্ষতি নেই—কিন্তু, কেমন লাগল—লিখো। শুনতে পাই এটা সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। (যদিও একটু শক্ত-গোছের এবং একটু মন দিয়ে পড়া দরকার)

আজ ক'দিন যেন একটু জ্বরোভাব টের পাচ্ছি। জ্বর না হ'লে বাঁচি। তোমার ছেলে কেমন আছে? আশীর্ব্বাদ করি যেন শীঘ্র আরোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রাণধন বাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ে—আমার কথাটা একটু মনে ক'রে দিয়ো। নিতান্ত যেন ভুলে না যান এইটি মাঝে মাঝে কোরো।—শরৎ

প্রমথ, আমার একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে সু—র অত কথার মধ্যে হয়ত একটু সত্য নিহিত আছে। হয়ত ওঁরা (অর্থাৎ হরিদাস বাবু প্রভৃতি) বলিয়াছেন যে আমার একখানি বই দয়া করিয়া তাঁর কাগজে প্রকাশ করিয়া দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব। মস্ত ভুল প্রমথ। মস্ত ভুল !!

প্রমথ, সু—র সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা কোরো তার 'অ—'তে যদি

দয়া ক'রে আমার কিছু ছাপায় ত' কিছু টাকাকড়িও না হয় তাকে দিতে পারি। D— swine! সে লোকটা না কি 'পুণ্যের জয়' না কি একটা লিখেছিল। পুণ্যাত্মা লোকের এই লেখাই ত চাই।

৭

3/5/13

প্রমথ, 'চরিত্রহীন' পেলে কি না সে খবরটাও দিলে না। ইতিপূর্ব্বে দু-চার দিন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম—কিন্তু এই যে নিজের কায হয়ে গেছে বস্ চুপ ক'রে আছ। যা হোক্ ওটা পড়্‌লে কি? কি রকম বোধ হয়? আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার ভাল লেগে উঠ্‌ছে না—অন্ততঃ ভাল বলবার সাহস হচ্ছে না, না? কিন্তু, ভালই হোক আর মন্দই হোক অ্যানালিসিস্ ঠিক আছে, না? দার্শনিক গোছের।—নীরস? এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে ক'রে দিই। যদি ভাল ব'লে না মনে হয়, প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা কোরো না। হয় 'সাহিত্যে' না হয় 'যমুনা'য়, না হয়, 'ভারতী'তে বেরুতে পারবে, কিন্তু, তোমাদের এটা নূতন কাগজ—একটু 'পুণ্যের জয়,' কিম্বা ঐ রকমের ঘোরাল সতীত্ব, হিন্দুর বিধবা পুড়ে মরছে কিম্বা ঐ রকম জলধর সেন গোছের দিব্যি হবে। লোকেও খুব তারিফ ক'রে বল্‌বে—হাঁ, হিঁদু কাগজ বটে! হিন্দু ideal বজায় হচ্ছে। তা নইলে এ সব লেখা একে ত' শক্ত, তার পরে তেমন হিঁদু মাখামাখি নয়। রুচির দিক্ দিয়ে ত objection নিশ্চয়ই হবে টের পাচ্ছি। এ ব্যবসায় কোন্‌টা ভাল দাঁড়ায় সেইটা দেখা প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া চাই। কিন্তু, তোমার স্বাধীন নিরপেক্ষ

মতও চাই। আমি জানতে চাই আমার বন্ধু প্রমথনাথ কি বলেন। যদি তোমার নিরপেক্ষ মত এই হয় যে, ওটা ভাল হবে না, তা হ'লে যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করব। তোমার পড়া হয়ে গেলে আমাকে লিখো আমি চিঠি লিখে দিলে ফণী গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র কি এখনও বার হয় নি? বার হ'লে আমাকে যদি দয়া ক'রে একটা পাঠাও ত' বড় ভাল হয়। এবং যখন কাগজ বেরোবে তখন এক কপি পাঠিয়ে দিলে দেখ্‌তে পারব।

তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। তুমি না কি ভার নিয়েছ, তাই বলা, না হ'লে বলতাম না। যদি ধারাবাহিক নভেল বার কর তা হ'লে যাতে বেশ সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী—তপ—জপ—কুলকুণ্ডলিনী ফুলকুণ্ডলিনী থাকে তার চেষ্টা দেখবে। ওটা বাজারে বড় নাম ক'রে দেয়। আর দেখবে যাতে শেষের দিকে হয় দুটো চারটে হুড়মুড় ক'রে ম'রে যাবে— একটা বিষ খাওয়া চাই!) আর না হয়, কোথা থেকে হঠাৎ সবাই এসে এক যায়গায় মিলে যাবে! এ হ'লে লোকে খুব তারিফ করবে। এবং নূতন কাগজ বার করতে হ'লে এই সব নবেলের বড় আদর। আমাকেও যদি অনুমতি কর আমি চরিত্রহীনের বদলে ঐ রকম একটা চমৎকার জিনিস অতি সত্বর লিখে দিতে পারব। যা ভাল বিবেচনা কর লিখ্‌বে। আমি সেই মতই রচনা সুরু ক'রে দেব। যদি আমাকে হুকুম দাও ত ঐ সঙ্গে দুটো লাল কালিতে ছাপা তন্ত্র টন্ত্র পাঠাবে বিশেষ আবশ্যক।—ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এবং লিখে জানাবে কতগুলো (অর্থাৎ দুটো কি চারটে) সন্ন্যাসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্য কি রকম বীরত্ব করবে তারও একটু আভাস

দিয়ে দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কি না তাহাও লিখবে। ভাল কথা—তোমাদের পরম বন্ধু সু—র সম্বাদ কি, কেমন আছেন তিনি? কি করলেন? কি কি মন্ত্রণা তিনি আজ পর্যান্ত দিলেন শুনি? মন্ত্রণা যে মূল্যবান্ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো।—

তোমার স্নেহের শরৎ

প্রমথ, তামাসা করলাম ব'লে রাগ কোরো না যেন! নিছক তামাসা কারু ওপরে কোন রকম reflection নয় তাহা নিশ্চয় জেনো। তোমাকে একটু তামাসা করলাম শুধু এই জন্যে যে, তুমি না দেখেই 'চরিত্রহীনে'র জন্য মহা হাঙ্গামা লাগিয়েছিলে। আমি তোমাকে অনেক আগেই লিখেছিলাম এটা 'চরিত্রহীন', ষট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল Ethics আর Psychology! ধর্ম্ম নয়। যা হোক তুমি যে তোমার দলের মধ্যে আমার জন্যে অপ্রতিভ হবে সেইটাই আমার বড় দুঃখ। যে কেহ তোমাকে এ সম্বন্ধে বলবে তাকেই এই ব'লে জবাব দিয়ো শরৎ লিখতে যে জানে না তা নয়, তবে এটাতে তার কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় চোখে পড়ছে না। আমি যে গল্প বানাতে পারি তার কতক নমুনা ছেলেবেলাতেও পেয়েছ, সম্প্রতিও বোধ হয় পেয়েছ। এই ব'লে জবাবদিহি কোরো। আমি ভবিষ্যতে তোমাদের যাতে ভাল লাগে এই রকম ক'রে একটা নভেল লিখে দেবো, কিছু মনে কোরো না। আর এক কথা—অনিলা দেবী আমার দিদি—আমি নয়। কি কোরে তুমি জানলে যে একই ব্যক্তি? কেন এ কথা বিধুবাবুকে বললে? ভাল কর নি, আমি ত

তোমাকে কোথাও বলি নি এঁরা এক ব্যক্তি? দু কান চার কান করতে করতে কথাটা (যাহা মিথ্যা) প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তা হ'লে ভারী লজ্জার বিষয় হবে। কেন না, অনেক তীব্র সমালোচনা দিদি করবেন বলেছেন। ঠাকুরবাড়ীর বিরুদ্ধে তাঁদের কত স্থানে কত ভুল সেই সমালোচনা করবেন ব'লে আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। বোধ করি বড় grand হবে! শুনছি ঠাকুরবাড়ীর প্রায় সবাই শুধু নামের জোরেই আজকাল যা তা লিখছেন। সম্প্রতি ঋতেন্দ্রবাবুর একটা সমালোচনা ফাল্গুনের 'সাহিত্যে' কাণকাটার ইতিহাস ব'লে যা লিখেছেন, সমস্ত ভুল সম্বাদ, এমন মাথা উঁচু ক'রে সবজান্তা গোছ হয়ে যে মানুষে লিখতে পারে, দিদি লিখেছেন, এটা তিনি আর কখন কোন ইংরাজি বাঙলা বইয়ে পড়েন নি। আমার বিশ্বাস তাঁর অধ্যয়নটা a little bit *wide.* এ অবস্থায় লোকে যদি মনে করে একজন সামান্য কেরাণী এবং গল্পলেখক এই সমস্ত গম্ভীর সমালোচনা করছেন সেটা দেখ্‌তে শুন্‌তে বড় ভাল হবে না। তা ছাড়া দিদিও দুঃখ করতে পারেন। কথাটা পার ত উল্টে নিয়ো।—শ

৮

[জ্যৈষ্ঠ ১৩২০?]

প্রমথনাথ! তোমার একসঙ্গে দুইখানি পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি যদিও ফণীর পত্র পাইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তথাপি তোমার বৃদ্ধ বাগচি মশায়কে লইয়া এতটা করা উচিত হয় নাই। বুড়ো মানুষ শাপ শাপান্ত করিবে, ভাল নয়। একটু

বিনয় ক'রে বলিও যেন আর কিছু না মনে করেন। তিনি যখন কিছু সত্যই বলেন নাই তখন এ কথা এই পর্য্যন্ত। আমার তোমাদের Ev. Clubএ যে সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। কাছে থাকিলে দ্বিজু বাবুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আসিতাম। এর বেশী আর কিছুই করিবার আমার বোধ করি ক্ষমতা থাকিত না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাগলপুরে এবং এখানে একটা মতভেদ এই হয় যে, 'রামের সুমতি'র চেয়ে 'পথনির্দ্দেশ' ঢের ভাল। দ্বিজুবাবুকে আমার প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ো ত কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথাটাই final হবে এবং মতভেদও বন্ধ হবে। 'ভারতবর্ষ' যখন তোমার কাগজের মতই তখন এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য আমিই স্থির করব। এ বিষয়ে মনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই কথা, আমার বড় সময় কম। রাত্রে লিখিতে পারি না, সকালে ঘণ্টা দুই, তা হয়ত তাও সব দিন ঘটিয়া উঠে না। তোমাকে আমার একটা নিবেদন আমার 'যমুনা'কে একটু স্নেহ কোরো। 'ভারতবর্ষ' যেমন তোমার, 'যমুনা' তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয় একটু সে দিকে নজর রেখো ভাই। ফণীকে আমি স্নেহ করি সত্য, কিন্তু তাই ব'লে যে তোমার অসম্মান ক'রে কিম্বা তোমাকে উপেক্ষা ক'রে, তা সে ফণী কেন, কাহারো জন্যই সেটা আমি পারিব না। সেই জন্যই 'চরিত্রহীন' পাঠাই। যদিও এই পাঠানো লইয়া অনেক কথা হইয়া গিয়াছে এবং হইবে তাহা জানিয়াও আমি পাঠাইয়াছি। যা হোক্ তোমাদের যখন ওটা পছন্দ হয় নাই তখন আমাকে ফেরত পাঠাইয়ো। বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া হইয়াছে সেই মত 'যমুনা'তেই ছাপা হইবে।

তুমি বলিয়াছ একেবারে পুস্তকাকারে ছাপাইলে ভাল হয়। সত্য, কিন্তু এতটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, যদি নিজের স্বার্থের জন্য ফণীকে না দিই সে বড়ই দেখিতে মন্দ এবং লজ্জাকর হইবে। তুমি যা লিখিয়াছ তাহা আমিও জানিতাম। আমি জানিতাম, ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে কথা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে, এ সম্বন্ধে আমার এই একটু বলবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া 'মেসের ঝি'কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক বিশেষজ্ঞ ও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছ। এ একটা Scientific Psych. and Ethical Novel: আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউন্ট টলষ্টয়ের 'রিসরেকশন' পড়েছ কি? *His Best Book* একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে, আমাদের দেশে এখনো অতটা art বুঝিবার সময় হয় নাই সে কথা সত্য। যা হোক, ওটা যখন হইল না তখন এ লইয়া আলোচনা বৃথা। এবং আমারও তেমন মত ছিল না। তোমাদের ওটা নতুন কাগজ, ওতে এতটা সাহসের পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত। তবে, আমারও আর অন্য উপায় নাই। আমি উলঙ্গ বলিয়া artকে ঘৃণা করিতে পারিব না, তবে যাতে এটা in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করব। আমাকে Registry ক'রে পাঠিয়ে দিও, ফণীকে দিবার আবশ্যক নাই। তোমাদের প্রথম সংখ্যার জন্য কি দিব ভাই?

কি রকম চাও একটু লিখে জানালে বড় ভাল হয়। আমার যথাসাধ্য করিব। হাঁ, আর একটা কথা, এর পূর্ব্বে আমাকে যদি কেহ এ বিষয়ে একটু সতর্ক করিত, অর্থাৎ বলিত—ঝি লইয়া সুরু করাটা ঠিক নয়, আমি হয়ত আলাদা পথ দিয়া যাবার চেষ্টা করতাম। তা সে কথা কেহই বলিয়া দেয় নাই। এখন too late. 'পাষাণ'টা কি ভাল মনে নেই। নিজের কাছেও নেই। তা ছাড়া ও ছেলেবেলার লেখা। না দেখে না সংশোধন ক'রে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। করলে হয়ত কাশীনাথের মত হয়ে দাঁড়াবে। আমার 'চন্দ্রনাথ' গল্পটা মনে আছে? সেটাকেও এখন সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালতে হয়েছে। সেটা যমুনায় বেরুচ্ছে। এটা শেষ হ'লে চরিত্রহীন বার করা হবে ব'লেই সকলে স্থির করেছেন। সমাজপতি মশাইকে দিবার কথা ছিল, এবং এ জন্য তিনি পত্রাদিও লিখেছিলেন কিন্তু ফণীর কাগজ যে আমার কাগজ।

তুমি ফণীর উপরে রাগ কোরো না। লোকটা ভালই। কিন্তু সে কি ক'রে জানবে তুমি আমি কি, এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোক মনে করে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব যে কাহাদের মধ্যে, কিরূপ বন্ধুত্ব তা সে বেচারা কি ক'রে জানবে?' তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না প্রমথ! যদি কোনদিন এ বিষয়ে তার সঙ্গে তোমার কথা হয় বোলো, বাইরের লোককে কি জানাব, শরৎ আমার কি এবং আমি শরতের কি! বরং না জানাই ভাল। তুমি আমাকে যা যা লিখেছ একটু ভেবে চিন্তে পরে তার জবাব দেব। তুমিও একটু শীঘ্র জবাব দিয়ো। হরিদাস বাবুকে এবং প্রাণধন ভায়াকে আমার কথা একটু মনে ক'রে দিও।—শরৎ

৯

[ডাকমোহর ১২ মে ১৯১৩]

প্রমথনাথ, তোমার তৃতীয় পত্র পাইলাম। পূর্ব্ব পত্রের যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি, তথাপিও যে ইহার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি তাহার কারণ আমি তোমাকে শুধু যে ভালবাসি তাহা নহে, শ্রদ্ধাও করি। অর্থাৎ মতামতের উচ্চ মূল্য দিই। আমার যাহা বলিবার বলি, তাহার পরেও যদি তোমার সেইরূপ ইচ্ছাই থাকে, যথাসাধ্য তোমার অভিরুচি পালন করিতে চেষ্টা করিব। লিখিয়াছ বিধবা ভিন্ন ছোট গল্প জমে না (ঠাট্টা করিয়া ?), হয়ত তোমার কথাই সত্য, অত বড় বঙ্কিমবাবুও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস দুটিতে (কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ) বাদ দিতে পারেন নাই। তুমি আমার 'পথনির্দ্দেশ'কেই কটাক্ষ করিয়া বোধ করি বলিয়াছ। বুঝিতেছি ওটা তোমার ভাল লাগে নাই। তাই যদি সত্য হয়, আমার উপদেশ এই, আর উপন্যাস গল্প প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা ত নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও উচিত হইবে না। এক একটা painter যেমন colour blind থাকেন, তুমিও তাই। 'রামের সুমতি'তে আর্ট কম তবুও যদি একেই এত ভাল লাগিয়া থাকে, যার কাছে তার পরেরটাও কিছুই নয় হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই নিরুপায়। এ শুধু আমার মত নয়। কথাটা বিশ্বাস কর এ প্রায় সকলেরই মত। তা ছাড়া, আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেও এই বলি। পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে 'পথনির্দ্দেশে'র কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে। অনেক নীচে। আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া

'রামের সুমতি'র মত একটা নমুনা লিখি—এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যত রকমের সম্বন্ধ আছে—সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক একটা গল্প লিখিয়া এই বইখানি সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে। যাক্। 'চরিত্রহীন' ফিরিয়া (registry) পাঠাইয়ো। এ সম্বন্ধে ঋষি Tolsoy'র "Resurrection" (the greatest book) পড়িয়ো। অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাতে নাই জানি না। ডাক্তারের উপমাটি ঠিক খাটে না। সমাজের যদি কেউ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কে শুনি? যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধা হয় না। শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস-লেখকের আরো একটা গভীর কায আছে। সে কাযটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে। Austin, Marie Corelli প্রভৃতি এবং Sarah Greand সমাজের অনেক ক্ষত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়। তা ছাড়া central figure করিতেছি কি করিয়া বুঝিলে? অবশ্য বদনাম যে হইবে তাহার নমুনা পাইতেছি, কিন্তু জানই ত, ভয়ে চুপ ক'রে যাওয়া আমার স্বভাব নয়। তুমি বলিতেছ, প্রমথ, লোকে নিন্দা করিবে, হয়ত তাই, কিন্তু এই এক 'চরিত্রহীন' অবলম্বন করিয়া 'যমুনা'র কিরূপ উন্নতি হইবে না-হইবে, দেখাও আবশ্যক। মনে করিও না, যাহা ছোট, তাহা কিছুতেই বড় হইতে পারে না। ছোটও

বড় হয়, বড়ও ছোট হয়। সেও যাক্। গল্প লিখিয়া তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিব সে আশা আমি আজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম। তোমাদের কাগজের জন্য কিরূপ গল্প খাটিবে—এটা বুঝিতে পারাই আমার পক্ষে শক্ত হইবে। এ যদি সন্দেশ তৈরি হইত, না হয় একটু ছোট বড় করিয়া ছানা চিনির ভাগ বেশী কম করিয়া করিতাম—কিন্তু এ যে মনের 'সৃষ্টি'। সেই জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করিলেও তোমার কাগজের জন্য কিছু করিতে পারিব তাহাও ভরসা করিতে পারিতেছি না। বাস্তবিকই যদি তোমার কাযে আসিতে পারি, তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে, কিন্তু আমার কায যে তোমাদের কাছে অকায বলিয়া ঠেকিবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, রাগ করিও না—তোমার view এত narrow হইয়া গেল কিরূপে এই একটা কথা আমি কেবলই মনে করিতেছি। তুমি "নারীর মূল্যে"র সুখ্যাতি করিয়াছ—জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা (যমুনা) পড়িলে তুমি যে কত নিন্দাই করিবে আমি তাই ভাবিতেছি। তোমার "অর্থের মূল্য" লেখ। কি রকম লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, খুব ভাল। তবে বিদ্বানের সব দেশে পূজা হওয়া (বড়লোকের চেয়ে) উচিত নয়—কথাটা প্রমাণ করিবে কি করিয়া বলিতে পারি না। অবশ্য পূজা ত সে পায় না কিন্তু পাওয়া উচিতও নয় সেইটাই প্রমাণ করা শক্ত হইবে বোধ হয়। তোমাদের কাগজের চারিদিকেই নাম হইয়াছে, সকলেই বলিতেছেন দুই এক মাস নমুনা দেখিয়া তবে গ্রাহক হওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিব। সুতরাং প্রথম দু এক সংখ্যা যা-তা হইলে কখনই চলিবে না। কেন না

দাম ঢের বেশী—ঠিক এই পরিমাণেই লোকে আশা করিবে। অন্ততঃ এই ত বর্ম্মার view. প্রথমেই যেন লোকে prejudiced না হইয়া যায়। আশা করি ফিরৎ ডাকে 'চরিত্রহীন' পাঠাইবে। তোমাকে পূর্ব্ব পত্রেই জানাইয়াছি—ওটা যমুনাতেই বাহির হইবে—অবশ্য কাগজ বড় করিয়া। অবশ্য ফলাফল তার কপাল আর আমার চেষ্টা এবং ভগবানের হাত। নামে প্রকাশ করার কথা। এত কুরুচিপূর্ণ তখন ত নিশ্চয়ই আমার নিজের নামে প্রকাশ করা চাই। যা শক্ত জিনিস সেই ভার সইতে পারে। আর এক কথা। **চোখের বালি** তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটায় বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির "উমা"। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই, পরে কি করিব কি জানি! তুমি আমার উপর রাগ করিয়ো না প্রমথ। তোমাকেও যদি মন খুলিয়া না বলিতে পারি, তা হইলে আর কাকে বলিব? তোমাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা আমার খুবই প্রবল ছিল, কিন্তু, আর সাহস নাই। 'বিধবা' ছাড়া গল্প জমে না এই যখন তোমাদের *negative standard*—তখন আমার আর কিছুমাত্র উপায় নাই। তোমাদিগকেও একটা সামান্য উপদেশ আমার দিবার আছে, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিয়ো, না হয় করিও না। তোমাদের পোষা লেখকগুলিকে যদি অমন ফরমাস্ দিয়া লেখাও, আর প্রতিপদে overseerএর মত 'level' দড়ি হাতে মাপ জোক করতে যাও, সমস্ত লেখাই আড়ষ্ট হবে। এ কাগজ ultimately failure হবে। যারা সুলেখক, এবং যথার্থই যাহাদিগকে 'কবি' বলিয়া মনে কর,

তাহাদের সমালোচনা কর, কিন্তু লেখাও প্রকাশ কর। লোককে ভাল মন্দ দুইই বলিবার সুযোগ দাও—গাল দাও কিন্তু প্রকাশ হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়ো না। পাদরিদের 'hymn' বা গির্জ্জার '*prayer*' শুধু যদি নিজেদের কাগজটাকে ক'রে তোল সে টিকসই হবে কি? আমি অনেক কথা লিখলাম—কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে পাছে মনে কর আমার এই লেখার মধ্যে একটু রাগ বা জ্বালা আছে। কিচ্ছুটি নেই। তুমি যে আমাকে সরলভাবে লিখেছ এতে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। এতে আমি বুঝতে পাচ্ছি, এমন অবস্থায় যিনি মিত্র ন'ন তিনি কি বল্‌বেন। অবশ্য বইটাকে immoral বলায় একটু দুঃখিত যে না হয়েছি তা নয়, কিন্তু উপায় কি? ভিন্নরুচিহি লোকঃ। 'পথনির্দ্দেশ' গল্পটাই যখন 'immoral' ঠেকেছে (কারণ লিখেছ,—"এটা ঠাট্টা" কিন্তু কোন্‌টা ঠাট্টা বোঝা ভার) তখন 'চরিত্রহীন' এ ত স্পষ্টই নিশান এঁটে দিয়ে immoral করা হয়েছে। এও যাক। তোমার খবর কি? খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছ না? বাস্তবিক একটা মাসিক চালানো ভয়ঙ্কর শক্ত। কোন ক্রমশঃ উপন্যাস বার হচ্ছে কি? লেখক কে? কিন্তু জলধর সেন টেনের বিশুদাদা টাদা অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে গেছে। আমাদের এখানেও বড় কম বাঙ্গালী নেই এবং যারা আছে তারা একটু বেশ বোঝে সোঝেও কিন্তু ওসব আর কেউ পড়তে চায় না। এমন কিছু বার কর্‌বার চেষ্টা কর যা—উজ্জ্বল! পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশ থেকে নড়তে পারে না আশা করি তোমরা যা বার কর্‌বে আমরা তাতে সেইরূপ—আকৃষ্ট হয়েই থাক্‌ব। তা যদি না পার, কাগজ চালিয়ো না। সেই খোড়—বড়ি—খাড়া আর খাড়া—বড়ি—খোড়

আর আবশ্যক কি? আমার মনে আছে 'বঙ্গদর্শনে' যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' বার হয় লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাকৃত। আসা মাত্র কাড়াকড়ি পড়ে যেত। তোমরা যদি কিছু কর, যেন এমনি successful হয়। কারণ তোমাদের resource বিস্তর—হাতে বিস্তর লোক আছে। এবং সবচেয়ে বেশী টাকা জিনিসটাও আছে। শুনেছি, তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র বার হয়েছে, খুব আশা করেছিলাম একটা পাব। বোধ করি পাঠাবার আর আবশ্যক বিবেচনা কর নি। যাই হোক তাতে কি কি ছিল একটু সংক্ষেপে যদি লিখে জানাতে পার হয় ভাল। আজ এই পর্য্যন্ত। কি জানি এত বড় দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তোমাকে ব্যথা দিলাম, কি, কি করিলাম। আমিও ব্যথা পাইয়াছি। তুমি যে লিখিয়াছ চরিত্রহীন অপরের নামে প্রকাশ করিতে এইটাতেই সবচেয়ে বেশী। আমি কি এতই হীন? যা আমার মন্দ জিনিস তাকে বেশী ক'রেই আমার নামের আশ্রয় দেওয়া চাই। তা না করিয়া একটা fictitious নামে, (নিজের নাম বাঁচাইবার জন্য) চালাইব? ভাল মন্দ যাই হোক consequence আমার ভোগ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকিলে ভায়া, এত দিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না। আমার ভালবাসা জানিয়ো মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়ো।—শরৎ

১০

[ডাকমোহর ২৪ মে ১৯১৩]

প্রমথ, দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazetteএ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে খুব কম জানিতাম তাহা নহে; অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড কম ছিল না। সত্যই তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক মিলিবে না। কে যে কখন যাত্রা করেন তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালী মাত্রেরই ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমাদের পাড়ার যে কিরূপ ক্ষতি হইল তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। তাঁহার ছেলে, বাড়ী, Evening Club প্রভৃতির আরো একটু বিস্তারিত সম্বাদ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম—এবার যখন পত্র লিখিবে একটু জানাইয়ো। তোমাদের ভারতবর্ষের সত্যই বড় দুরদৃষ্ট। আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত, এ কাগজ আর বাহির হইবে না। বাহির হইলেও খুব সম্ভব ইহা টিকিবে না। কারণ ইহার আসল আকর্ষণই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিয়ো না। সারদা মিত্র কি করিবেন? তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক। Compilerও বটে, লেখা অত্যন্ত মামুলি ও পুরাণ ধরণের। তিনি খুব সম্ভব failure হইবেন। সাহিত্য পরিষদের মোড়ল হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক ন'ন এটা মনে রাখিয়ো। অবশ্য তোমরা কলিকাতায় থাক আমরা মফস্বলে থাকি এ সব মতামত আমরা দিতে পারি না দিলেও তোমাদের কাছে সেটা বোধ করি তেমন গ্রাহ্য হইবে না—যাই হোক,

যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। এবং তাঁহাকে সম্পাদক করিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাই জানাইলাম। শেষে আমার কথা। তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য তাহা নিশ্চয়ই করিতাম কিন্তু এখন তিনি আর নাই। তিনি সাহিত্যিক এবং বোদ্ধা ছিলেন, তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন—এবং না বুঝিলেও, তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না—অভিমানও হইত না, কিন্তু এখন যে-সে আমার দাম কষিবে, হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়—হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা 'file' কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর।—তুমি আমার কত বড় সুহৃৎ তাহা আমি জানি—সে কথাটা এক দিনের তরেও ভুলিব না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু, এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। সুরু হইতেই তোমাকে বলিতেছি তোমাদের লেখকেরা সাগরতুল্য। যাঁহাদের রচনা এবার বাহির হইবে বলিয়া লিখিয়াছ, অনুরূপা, বিদ্যাবিনোদ, নগেনবাবু প্রভৃতি। তাঁহাদের লেখার কাছে আমার লেখা যে গোষ্পদের মত দেখাইবে! আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই—এর বেশী আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা চরিত্রহীন সম্বন্ধে। আমার সুরেন মামা লিখিয়াছেন—হরিদাস বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন ওটা এতই immoral যে কোন কাগজেই বাহির

হইতে পারে না বোধ হয় তাই হইবে—কারণ তোমরা আমার শত্রু নয়, যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে—আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব ওই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে। আমিও সেই কথা স্পষ্ট করিয়া এবং তোমার সমস্ত argument ফণীকে খুলিয়া লিখিয়াছিলাম তৎসত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যমুনাতে ওটা বাহির করিতেই হইবে। তাহার বিশ্বাস আমি এমন কিছু লিখিতেই পারি না যাহা immoral. সেই জন্য বাধ্য হইয়া তোমার অনুরোধ ভাই রক্ষা করিতে বোধ হয় পারিলাম না। কারণ advertise করা হইয়াছে আর ফিরান যায় না। আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকের যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক, কিন্তু সে যখন বিশ্বাস করে, চরিত্রহীনের দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং immoral হোক, moral হোক লোকে খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে—তখন সে যাহা ভাল বোঝে করুক। তবে, একটা উপায় করিতে হইবে। 'রামের সুমতি'র মত সরল স্পষ্ট গল্প পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া চরিত্রহীনের effectটা mild করিয়া আনিতে হইবে। ফণী লিখিয়াছে লোকে আমার গল্প পড়িবার জন্য উতলা হইয়া আছে। যাক এ কথা। **'কাল' আমার বিচার করিবে।** মানুষ সুবিচার অবিচার দু-ই করিবে সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল। যাক্। এই সময়টা যদি আমি কলিকাতায় থাকিতাম, তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য অনেক করিতে পারিতাম। কোন নামজাদা সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া কাগজটাই edit করিয়া দু এক মাস চালাইয়া দিতে পারিতাম। আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা ছাড়া সব রকমই পারি, এবং যেটা সম্পাদকের প্রধান কাজ, 'সমালোচনা' (অপর কাগজের

লেখার উপর) সেটাও আমার বেশ আসে। তবে, যখন কলিকাতাতে নাই, এবং শীঘ্র থাকিব এ আশাও নাই—তখন এ সব কথার আলোচনায় লাভ নাই। এই দূর দেশে কম সময়ে আমি শুধু যমুনার জন্যই একটু আধটু লিখিতে পারি এর বেশী সময় এবং স্বাস্থ্য দু-ই নাই। তুমি আমার উপব যেন একটুও দুঃখ করিও না এই আমার মিনতি। দ্বিজুবাবু আর নাই—আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে **অসাধ্য**। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া। তাছাডা আমি এক রকম প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ছোট্ট যমুনাকে বড করিব। এ জন্য আমার শিষ্যমণ্ডলীকেও অনুরোধ করিতে হইবে বলিয়াও একটা কথা উঠিয়াছে। আমি জানি আমাকে তারা এত শ্রদ্ধা করে, যে আমি অনুরোধ করিলে তারা কিছুতেই অস্বীকার করিবে না— শুধু এই জন্যই এখনো তাহাদিগকে অনুরোধ করি নাই। আশা আছে প্রমথ, এদের সাহায্য লইলে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত হইবে। শুনিতেছি এরি মধ্যে যমুনাব বেশ আদর হইয়াছে। তাই প্রতি মাসে যদি এমনই আদর অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় হইবে আশা করা যায়। কাগজটা আগামী বৎসর হইতে ডবল সাইজে বাহির করিবার কথা আছে। তোমার কথা রাখিবার জন্য সমস্ত জানিয়াও এবার চরিত্রহীন পাঠাইয়াছিলাম আবার যখন আবশ্যক হইবে, তোমার কথা **রাখিবই**। কিন্তু পরের জন্য আমাকে আর লজ্জা দিও না ভাই। হরিদাস তোমার বন্ধু, আমি কি তার চেয়ে কম ? তোমাকে যত লোক যত ভাল বাসিয়াছে, আমি কারুর চেয়ে কম বাসি নাই, সেই কথাটা যখন আমার উপর রাগ হইবে তখন স্মরণ করিয়ো। আর কি বলিব!

আমি ওখানে লেখা দিয়া আর অপ্রতিভ হইতে ইচ্ছা করি না। ওখানে ঢের বড়লোক লেখেন, আমার জন্য এতটুকু এক তিলও ফাঁক পড়িবে না। ফণীও তোমার নাম করিয়াছে। বিস্তর সুখ্যাতি করিতেছিল।

তোমার নিজের সম্বাদ লিখিবে। আমার সম্বাদ একই রকম। কখন ভাল, কখন মন্দ। রেঙ্গুন আর সহ্য হইতেছে না প্রতি পদেই টের পাইতেছি কিন্তু অন্য কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। কি জানি এইখানের মাটিই কেনা আছে কি না!—তোমার স্নেহের শরৎ

১১

31. 5. 13

Rangoon.

প্রমথনাথ, আজ তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার পূর্ব্বেকার পত্র তোমার হাতে যায় নাই। যদি এত দিনে গিয়া থাকে নিশ্চয়ই সমস্ত বুঝিয়াছ। এই ত ভাব। তার পরে আমার যাবার কথা। আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি। আমাদের বড় সাহেব Newmarch. 'গোরা'তে রবিবাবু বলিয়াছেন "আমি মাধব চাটুয্যে নীলকরের গোমস্তা।" এর বেশী আর বলার আবশ্যক নাই। Newmarchও ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরাণীকে reduce করিয়াছেন। অপরাধ একজনের চিঠি despatch করতে ৩ দিন দেরী হয়—আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরাণ

চিঠি বার হয় এই রকম। এঁর দৌরাত্ম্যে, Deputy Acctt. General Chanter সাহেব, Dy. Acctt. General শ্রীনিবাস আইয়ার, Asst. Acctt. General সুন্দরাম, Asst. Acctt. General Mgset, ১ মাসের মধ্যে Medical certificate দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে, আমাদের P. W. D. লোকেদের নিজের অফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের office hour, strictly with hardest labour from 10-30 to 6-30। নিয়ম এই যে যদি কারু কোন দিন কোন তরফ থেকে reminder আসে—৬ মাসের জন্য ১০৲ হিসাবে (জরিমানা) reduction. এই ত সুখের চাকরি। তার উপর সে দিন Local Govt.কে এই ব'লে move করেছেন যে আফিসের কেরাণী ঘুষ দিয়ে m. certificate দিয়ে পালায় তাতে আফিসেব অত্যন্ত ক্ষতি হয়, সেই জন্য আফিসের চিঠি না গেলে Civil surgeon কাউকে যেন m/certificate না দেন। আমাদের এখন m. c. দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। M. c. দিলেও বলে ওর Service bookএ নোট ক'রে রাখ মিথ্যা m. c.। বর্ম্মা ব'লেই এত জুলুম চ'লে যাচ্ছে। দিন ৩।৪ পূর্ব্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা reminder আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না—এটি আমার Sub Auditor ভৌমিক বাবু ও Peria Swamyর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। Explanation দিলাম আমারই oversight: ইত্যবসরে resignation লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০৲ টাকা গেছেই। এ অপমান সহ্য ক'রে যে চাকরি করে সে করে, আমি ত কিছুতেই

পারব না এই জেনেই লিখে রাখি। যা হোক কি জানি New-marcn দয়া ক'রে কোন কথাই বল্লেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না আমার আর resignation দেওয়া হ'ল না। কিন্তু শরীরও আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এত দিন চাকরি কচ্ছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দ্দশায় কখন পড়ি নি। সে দিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মিত্তির মশাইকেও চিঠি লিখি যে যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি resign দিয়ে চ'লে যাই। তাঁর এখনো জবাব আসবার সময় হয় নি। তবে এও বুঝতে পাচ্ছি এই সাহেব (ডালকুত্তা) যদি না যায় শীঘ্র, যাবার বড় আশাও দেখি নে—তা হ'লে আমাকে অন্ততঃ ছাড়তেই হবে। শালা অন্য আফিসে application পর্য্যন্ত forward করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না।

দেখি মিত্তির মশাই কি লেখেন।

আমার 'ভারতবর্ষে' লেখার অনেক গোলমাল। সারদা বাবুকে জানি না—তিনি যে কি করবেন তিনিই জানেন। দ্বিজুবাবুই এ কায পারতেন—এ কি সারদাবাবুর দ্বারা হবে। ওর চেয়ে তোমার যোগ্যতা এতে বেশী। বিদ্যাপতি edit করা আর ভারতবর্ষ edit করা এক জিনিস নয়। তা ছাড়া তাঁর অনেক কায। এ selection একেবারেই ভাল হয় নি। সারদাবাবু সত্যরঞ্জন রায়ের 'অবগুণ্ঠিতা'র যে প্রশংসা করেছিলেন, তাইতেই বোঝা গেছে উনি কি রসগ্রাহী!! সত্যরঞ্জন এখানে ছিল, তার অনেক লেখাই পড়েছি। অবগুণ্ঠিতার চেয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদের 'অধঃপতন' ভাল।

Very bad selection—ভারতবর্ষ এক বৎসরের মধ্যে 'Failure' হবে !!!

এ যদি না হয়, মিথ্যাই এত দিন সাহিত্য সেবা করলাম।

দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ—এত বেশী আয়োজন, এত বেশী subscription—আর কেউ চালাতে পারবে না। হরিদাসবাবুর বোধ করি বন্ধ ক'রে দেওয়াই উচিত। এ কাগজ successful হবার হ'লে দ্বিজুবাবু অন্ততঃ ৬টা মাসও বাঁচতেন। এই আমার ধারণা। একে superstitionই বল আর যাই বল।

দ্বিজুবাবু আবশ্যক হ'লে ও কাগজ প্রায় একাই ভরিয়ে দিতে পারতেন। প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে, কালিদাস ভবভূতির সমালোচনার মত সমালোচনায় যেমন ক'রে হোক আবশ্যক হ'লে চালিয়ে দিতে পারতেনই—এ কি আর কারো কাজ। তা ছাড়া কাগজ যে ছোট নয়—৬৲ টাকা চাঁদা—সেটাও বড় কম ভাবনার বস্তু নয়। প্রবাসী এত দিনের কাগজ—একটা স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তবু তাকে অনুবাদ ক'রে, পাঁচটা খবরের কাগজের বাজে খবর তুলে ভরাতে হয়। ওর অর্দ্ধেকের উপর ত অপাঠ্য। তবু ওর চাঁদা কম। তোমাদের সে excuseও নাই। তা ছাড়া, ভাই, অনেকেই বলে লিখবে, কিন্তু শেষকালে যারা নিতান্ত তোমার আমার মত লেখক তারাই লেখে। তা ছাড়া ভাল লেখক প্রায়ই লেখে না। দ্বিজুবাবুর সঙ্গে কি শুধু তিনিই গেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ influence পর্য্যন্ত গেছে। এই ধর আমি। আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর appreciationএর লোভেও

লিখতাম। সারদাবাবুর ভাল মন্দ বলার দাম কি? কে গ্রাহ্য করে?—শরৎ

১২

প্রমথনাথ, ভাই অনেক দিন যাবৎ তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আশা করি তুমি ভাল আছ, বাড়ীর সকলেও ভাল আছেন। পরশু V. P. ডাকে **তোমার** 'ভারতবর্ষে'র এক খণ্ড sample copy দশ আনা পয়সা দিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ দাম ॥০ মাসুল খরচা ৵০ একুনে ॥৵০ সেখানি ক্লাবে দিয়াছি—ফিরিয়া পাইলে পড়িব। যেদিন আসে, সেই দিন ঘণ্টাখানেক কতক কতক দেখিয়াছি মাত্র। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, যে, তোমাদের লেখার অভাব, কিন্তু ছাপাইয়াছ যে, এত ভাল জিনিস রহিয়া গিয়াছে যে স্থান সঙ্কুলান করিতে পার নাই। বাস্তবিক এটা বড় আশার কথা। কেন না আমিই এত বেশী telegraph, registered letter, শুধু পত্র, এবং উপহার মাসিক পত্র পাইতেছি, যে মনে হইয়াছিল, মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা লেখার জন্য বড়ই অসুবিধা এবং অভাব বোধ করেন, তাই আমার মত নগণ্য লোককেও এত বিব্রত করেন। যাঁদের কখনও নামও জানি না, তাঁরাও লম্বা চওড়া চিঠি দেন, শুধু যে বিপদে পড়িয়াই, এই বিশ্বাস আমার মনে ছিল। এখন দেখিতেছি বাস্তবিক তাহা নয়, কেন না, তোমাদের মত এই মর্ম্মে 'প্রবাসী'ও ছাপাইয়াছেন যে তাঁহারা শীঘ্র আর কাহারও কোন লেখা পাইতে ইচ্ছা করেন না—কারণ ভাঁড়ারে

তাঁহাদের অত্যন্ত বেশী জমিয়া গিয়াছে। আমি নিজেও অনেক দিন আর কিছু লিখি নাই মুখ্যতঃ অসুস্থ বলিয়াই। তবে, 'যমুনা'র জন্য না কি না-লিখিলেই নয়, তাই আষাঢ়ে গোটা দুই প্রবন্ধ (একটা প্রতিবাদ) লিখিয়াছিলাম মাত্র। গল্প লিখি নাই—লিখিতে ভালও লাগে না! তবে, তোমার কথামত আমার একটা মতলব হইয়াছে। "রামের সুমতি"র মত প্রেমবর্জ্জিত আমাদের বাঙালীর ঘরের কথা—(যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়) series of stories লিখিব মনে করিযাছি। বাঙালীর ideal অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। "বিন্দুর ছেলে" বলিয়া আর একটা লিখিয়া পাঠাইযা দিয়াছি—একবার মনে করিয়াছিলাম একবার তোমাকে দেখাইব, কিন্তু সময় হইল না। অবশ্য তোমাদের 'ভারতবর্ষ' কাগজের যোগ্য সেটা মোটেই হয় নাই, তার উপর আবার একটু বড় আয়তনের হইয়া পড়িয়াছে। 'ভারতবর্ষে'র মত কাগজের অন্ততঃ ২৬।২৭ পাতা—তাই, ও কাগজে ছাপান অসম্ভব বুঝিয়াই 'যমুনা'য় পাঠাইয়া দিয়াছি।

কৈ প্রভাত বাবুর লেখা দেখিলাম না ত? ও ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন। আর যে কি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না, অথচ অগ্রিম টাকাও লইয়াছেন। এ দিকে 'সাহিত্য'-সম্পাদকও 'বঙ্গবাসী' কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে প্রভাত বাবুর লেখা তাঁর কাগজ ছাড়া আর কোথাও বাহির হইবে না। ব্যাপার কি!

তোমাদের কাগজ বাহির করিবার জন্য তোমাকে বোধ হয় খুব পরিশ্রম করিতে হয়; এটা ভাল। এই সময়ে হয়ত তোমারও কাষ

হইয়া যাইতে পারে। যদি, সত্যই তোমার ভিতরে পদার্থ থাকে নাড়াচাড়া করিয়া এই সময়ে বাহিরে আসিতে পারে। এ সাহিত্যচর্চ্চার সংস্রবই আলাদা। তোমার মত এক হিসাবে নিষ্কর্ম্মা লোকের এই সময় যদি কিছু দায়ে পড়িয়া পরিশ্রম করিবার সময় নিজের বস্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ এবং সুযোগ পায় সেইটাই লাভের কথা তোমার।

গত বারে তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে "এ বিষয়ে এত সাধাসাধি" অনুনয় প্রভৃতি আরও কত কি হইয়া গিয়াছে যে আর বলা শোভা পায় না। আমি এইটাই ভয় করিয়াছিলাম যে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজেদের মন্দ না হইয়া যায় অর্থাৎ আত্ম মনোমালিন্যে না দাঁড়ায়!—শরৎ

১৩

[ডাকমোহর ২৫ জুন ১৯১৩]

প্রমথনাথ, ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় আমার অসম্পূর্ণ চিঠিটা পেয়েছ। যে দিন চিঠি লিখছিলাম, হঠাৎ দেখি ডাক নিয়ে পিয়াদা যাচ্ছে, আর সময় নাই, কাজেই যেটুকু লিখেছিলাম, বন্ধ ক'রে পাঠালাম। আজ তোমার আর একটা পত্র পেলাম। প্রথমে কাজের কথা বলি। 'দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না। শুধু যে ওটা আমার মাতাল হয়ে লেখা, তাই নয়, ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা immoral. বেশ্যা-চরিত্র ত আছেই, তা ছাড়া আরও কি কি আছে ব'লে মনে হয় যেন। আর আমার আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি—তা তোমাদের কাগজেই হোক

আর ফণীর কাগজেই হোক। আষাঢ়ের 'যমুনা'য় "আলো ও ছায়া" ব'লে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা। কিন্তু, এই একটা কথা যে আমার এত আপত্তি সত্ত্বেও তারা প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই ভরসা করবে না, সেই কারণেই ভাবছি—হয়ত আমার ছেলেবেলার লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে। যা হোক জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবো। সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে আমার কথা হয়েছে শুনে সুখী হলাম। তুমি যে বার বার বল্‌ছ আমি চাকরি ছেড়ে দিলেও ভয় নেই, এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। মিত্তির মশাই জবাব দিয়েছেন যে তিনি ৬ মাসের ছুটিতে আছেন, এবং এ অবস্থায় কি করতে পারেন? কথা ঠিক! আরও ভাবছি যদি চাকরি করতেই হয়, তবে সেখানেই বা কি, আর এখানেই বা কি; মৃত্যু এক দিন হবেই, এবং তাহা সত্যই আসন্ন সে চিহ্নও চারি দিকে ফুটে উঠেছে। তবে নিরর্থক ছুটাছুটি ক'রে লাভ কি! তবে, এই পূজার সময় একবার কলকাতায় যাব। ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অধিক কিছু চিন্তা ক'রে নিজেকে এবং পরকে পীড়িত করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে চুপ ক'রে আছি। 'ভারতবর্ষ' মোটের উপরে কি হয়েছে, তা কি তুমি নিজে জান না? আমাদের আষাঢ়ের 'যমুনা'য় এবার কিছু নেই, তবু বল দেখি ঐটুকু কাগজে যথার্থ readable matter যতটা আছে তার চেয়ে বেশী 'ভারতবর্ষে' আছে কি না! তোমাদের গল্পের ছবিগুলি আরও চমৎকার! পাঁজিতে জামাইষষ্ঠীর পুরাণো ব্লক তোলা ছবির মত। রাগ ক'রো না ভাই, সত্যি কথা একা বন্ধুর কাছে বলা যায় ব'লেই বললুম। দ্বিজুবাবু থাকতে লোকে

কত আশা করেছিল, তার চার ভাগের এক ভাগও যদি প্রথম সংখ্যাটায় বার হ'ত সেও ভাল হত, কিন্তু, তাও হয় নি। ওর মধ্যে যেটুকু দ্বিজুবাবুর লেখা, সাহিত্য হিসাবে সেইটুকুই ভাল। তার পরে তাম্র-লিপ্তি আর বেদের তর্জ্জমা। কি করব আমরা নিরক্ষর লোকে বেদের তর্জ্জমা ক'রে? আর অত বড় কাগজ এতে কি চলে? অন্ততঃ এমন একটা জিনিস continuously থাকা চাই যার জন্য গ্রাহকের মনে আশা জেগে থাকবে—সে কোথায়? একটা bold review থাকা প্রয়োজন—কই তা? শুধু তাম্রলিপ্তিতে সুবিধা হবে না দাদা, তা ব'লে দিলাম। গল্প অতি বদ। এই কি তোমাদের selection? 'ছিন্নহস্ত'টা বোধ করি হবে ভাল। তোমার লেখাও পড়েছি—কিন্তু একে সাহিত্য বলা চলে না। তবে প্রথম বারের কাগজ দেখে কিছুই বলা যায় না—খুব চেষ্টা কর যাতে 100 times ভাল হয়। এবারের 'প্রবাসী'ও দেখলাম। তারা তোমাদের কাগজের চেয়ে ভালই করেছে। এই সমস্ত আমার স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত—এর কতটুকু দাম, সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যদি কিছু থাকে, সেটা তুমি নিজের কাছেই গোপনে রেখো। তবে, 'প্রবাসী' লোকের কাছে অশ্রদ্ধাভাজন হয়ে পড়ছে, এই সময় ঠিক প্রতিযোগিতায় তাকে টলান যায়। অন্যথা যায় না। কারণ সে established! যাক এ সব কথা। কেন না, আমি দূরে থেকে যা বলব, হয়ত ঠিক না হতেও পারে। তোমরা সরজমিনে—man on the spot! প্রভাতবাবুকে দাদন দিয়ে রেখেছ, গল্প কই হে? তার পরে তোমরা টাকা দিবার অধিকারে গল্পের জন্য যখন তাগাদা সুরু করবে, তখন তেমনি গল্পই বোধ করি তিনি দেবেন!

যা হোক এ সব বাজে কথা। আসল কথা এই যে এই সব বাহিরের হাঙ্গামা নিয়ে যেন আপোষে বিবাদ না হয়। তুমি গত বারে যে রকম খাপ্পা হয়ে উঠেছিলে, ভয় হয়েছিল এই বারে বুঝি ভীষণ একটা কিছু হয়। তোমার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ কাল আছি ভাল। গত মাস দুই যাবৎ ঘাড় নীচু করলেই মাথা ধ'রে উঠত, তা লিখবই বা কি, আর পড়াশুনা করবই বা কি! গত চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছি, যে একটা গল্প লিখে 'যমুনা'য় পাঠিয়েছি—বস্তুটা ভালও হয় নি, অথচ দীর্ঘকায় হয়েছে —তোমাদের কাগজে সেটা কিছুতেই চলত না। চলবার মত নয় বুঝেই আর পাঠালাম না। ও কি প্রমথ, আমাকে 'ভারতবর্ষ' পাঠিয়ে দাম আদায় করছ কেন? আমি গরীব মানুষ, তোমাদের অত দামী কাগজ কিনে পড়বার যোগ্য লোক নই ভাই—আমি কোথাও থেকে চেয়ে টেয়ে পড়বার চেষ্টা করব,—আমাকে আর পাঠিয়ো না। আমি দরিদ্র ব'লেই এ কথা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জানালাম—কিছু মনে ক'রো না। বাড়ীর খবর ভাল ত? তোমার নাটক প্লে হবে না কি? খুব ভাল, খুব ভাল—বড় আনন্দের কথা!—শরৎ

১৪

14 Lower Pozoungdoung Street, Rangoon.

[ডাকমোহর ৮ এপ্রিল (জুলাই ?) ১৯১৩]

প্রমথনাথ, আজ তোমার পত্র পাইলাম। আজই একটা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম আমার পূর্ব্বপত্র বদ করিয়া, বোধ হয় পাইয়া ব্যাপারটা

বুঝিয়াছ। তোমার কথাই সত্য। ঠিকানা ছিল S. Chatterjee, Asst Actt General's Post Office. আমার বুদ্ধিমান asst. নগেন ভৌমিক আমার অবর্ত্তমানে V. P. P. গ্রহণ করিয়াছিল, আমি উপস্থিত থাকিলেও হয়ত লইতাম। সেই জন্য দোষ আমার—তোমাদের নয়। তোমাদের দোষ নাই বলিয়াই টিকিটগুলো লইতে পারিলাম না—না হইলে তোমার মান রক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতাম। Book Post পাই নাই এবং ভবিষ্যতে দিলেও পাইব না। ওসব আমার বাড়ীর ঠিকানায় দিলেই পাই, অন্যথা পাই না।

S. Chatterjee, 14 Lower Pozoungdoung Street, Rangoon. এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার পত্রের একটা একটা করিয়া জবাব দিই। দুটি একটি প্রবন্ধ মন্দ হয় নাই। তাম্রশাসন, আমার মত বেরসিক লোকেই পড়ে। সার অসার কি আছে না আছে আমাদের জানা উচিত। "কৌতূহল" ভাল।

৪। Variety হিসাবে তোমার কথা হয়ত সত্য ; কিন্তু variety মানে যদি ৩২॥০ ভাজা হয়, ত খেতে মন্দ লাগে না। তাতে বড়লোকের পেট ভরে, গরীবের ভরে না। Substantial জিনিস দুটোও ভাল, কিন্তু ৩২॥০ ভাজা ভাল নয়—আমি ওর পক্ষপাতী নই।

৫। ছবির সম্বন্ধে—noted.

৭। নির্ভীক মতামত—ঠিক কথা। যত দিন ঐ রকমের দ্বিজু বাবুর কাছাকাছি—ভাল মানুষ, সরল, অথচ গোঁয়ার-গোছের লোক না পাও, তত দিন সমালোচনা বাহির না করাই বুদ্ধির কায। তবে,

সাহিত্যের সমালোচনার মত সমালোচনা ভদ্রলোকের বাহির করা উচিত নয়। কেবল তীব্র ভাষা অথচ কেন তীব্র ভাষা তার কারণ দেখানো নাই। "তোমারটা ভাল নয়" "ওতে অনেক কথা বলবার আছে" "এ রকম সবাই জানে" "এ রকম না লেখাই উচিত" এ সব সমালোচনা নয়। সমালোচনায় যেন তাহার চৈতন্ত হয়, জ্ঞান হয়, শিক্ষা হয়। সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত—গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব, দাবাইয়া ধরিব এ মতলব ভাল নয়। হাঁ কানকাটার সমালোচনার মত সমালোচনাই যথার্থ সমালোচনা। সবাই লিখ্‌তে পারে না তাও হয়ত সত্য। কিন্তু আমারও বড় অসংযত ভাষা হয়ে গেছে। ঐ যে তুমি লিখেছিলে সবাই আজকাল প্রত্নতত্ত্বের লেখক—তাতেই আমার রাগ এবং একটু দ্বেষ হয়েছিল। সবাই যদি এত সহজে লিখ্‌তে পারে, তবে, কেন মিছে আমরা এত খেটে মরেছি? এই একটু রাগ—তাইতেই কিছু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে। তবে, তাঁরও জ্ঞান হবে যদি দয়া ক'রে প'ড়ে দেখেন—ভবিষ্যতে আর অমন ওপর-চালাকি করতে ব্যস্ত হবেন না। সত্যিই এতে একটু solid পরিশ্রমের দরকার হয়।

৮। না, যমুনাতে একসঙ্গে অত বার হবে না। চন্দ্রনাথ এখনো শেষ হয় নি। নারীর মূল্য এবারে অসুস্থতার জন্য শেষ করতে পারি নি। আলো-ছায়া কি আমার লেখা? তাইতেই মনে হয়েছিল বটে, কোন অপরিণত কাঁচা লেখক আমার লেখার style অনুকরণ করেছে। আমি গত পত্রে ঠিক এই কথা ফণীকে লিখেছি। বড় অন্যায়! বড় অন্যায়!! বিন্দুর ছেলে প'ড়ে দেখো। শুনলাম যমুনার

৩২ পাতা হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল তোম'দের ভারতবর্ষে ওটা অশোভন হবে এবং ভালও হয় নি। তোমার ভাল লাগবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। একটুও প্রেমের কথা নেই, নিতান্তই বাঙালীর ঘরের কথা! অনেকটা মেয়েদের জন্য—তারা যেন একটু শিক্ষা লাভ করে—এই ইচ্ছায় লেখা। ঐ রামের সুমতির ধরণের তবে বেশী character আছে—এবং তাহাদিগকে পরিস্ফুট করবার জন্যই একটু বেড়ে গেছে। যাক্।

দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়। সুরেনরা আমার সব লেখারই বড় তারিফ করে, তাদের ভাল বলার মূল্য আমার লেখা সম্বন্ধে নাই। ওটা ছাপা হয় তাও আমার ইচ্ছা নয়।

সত্যিই আজকাল কি গল্পই বার হয়! কেবল লোকের চেষ্টা কি ক'রে পাঠকের মনে কষ্ট দেয়! হয়, অমানুষিক অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে, না হয় খুনজখম করে—আরে বাবু রাস্তায় কুকুর ঠেঙ্গান দেখলেও ত কান্না পায়—সেইটাই কি তবে দেখাতে হবে? না সেটা সাহিত্য?

গল্প পারতপক্ষে tragedy করতে নেই। কুৎসিৎ ভাবগুলো দেখাতে নেই—ওসব সবাই জানে। দীনেন্দ্র বাবুর 'সাহিত্যে' 'দাদা' পড়েছ? প'ড়ে বাস্তবিক অভক্তি হয়ে গেল! গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় "আহা বেশ!" তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চল্‌ছি। রামের সুমতি, পথনির্দ্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ ক'রে একটা আনন্দ হয়—শেষ ক'রে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাস বাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে "রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা

করে”—এই সমালোচনাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। ভাল কথা—“ক্ষুদ্রের গৌরব” “ছায়া” “বিচার” ওসব কি? আমার ত একটুও মনে নেই।

তোমাদের সমাজপতির সম্বন্ধে ওসব কেচ্ছার ব্যাপারটা কি? তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য আমি অভাজন কি করতে পারি ভাই? অত বড় বড় কৃতবিদ্য লোক রয়েছেন তার ওপরে আমি কি করব? তবে এক আধটা প্রবন্ধ বা গল্প লিখে দিতে পারি, তাও সত্যি সত্যি ভয় হয় প্রমথ, হয়ত বা ফেরৎ আসবে। ঐ লজ্জাতেই আমার যেন হাত পা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। আচ্ছা বিন্দুর ছেলে প’ড়ে যদি এমন সাহস তুমি দাও যে ওটা তোমাদের ভারতবর্ষে পাঠালেও নিশ্চয় ছাপা হোতো, তাহ’লে নিজের ওজন বুঝে দেখবার চেষ্টা করব। এই কথা দিলাম। তবে আমি ভাই অশ্রদ্ধা ক’রে, যা-তা লিখে দিতে পারব না। নিজের অন্ততঃ চলনসই মনে না হ’লে পাঠাই নে। তোমরা ফণীকে দেখতে গিয়েছিলে শুনে বড় সুখী হোলাম। এই ত বন্ধুর মত কায!

আমার কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে লিখেছি। তবে কি না জানো ভাই ‘সাহিত্য’ অবলম্বন করতে আমার ভারী লজ্জা করে। ওটা যেন উঞ্ছবৃত্তির সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও একটা ৪০।৫০৲ টাকার চাকরি যোগাড় ক’রে দিতে পার ত যাই। আমার Govt. service ব’লে একটুও মায়া নাই। এ শালার আফিস রাস্তার কুলিগিরির অধম।

আমার ইচ্ছে করে চাকরি ক’রে পেটের ভাতের যোগাড় ক’রে

সাহিত্য সেবা ক'রে যদি দু পয়সা পাই ত বই কিনি। আমার বিস্তর বই পুড়ে যাবার পরে এই আকাঙ্ক্ষাটাই আমার বড় প্রবল।

আমার 'চরিত্রহীন' বোধ হয় modified হয়ে, আশ্বিন কার্ত্তিক থেকে বেরুবে। ততদিনে চন্দ্রনাথ শেষ হবে।

হাঁ ভাল কথা। আমি কলিকাতা এবং আরো দু-এক যায়গা থেকে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মতামত পেয়েছি। সত্যিই কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। সকলেই লিখেছে—ওঁদের মধ্যে "পছন্দ" ব'লে যে একটা জিনিস আছে তা নমুনা দেখে মনে হয় না। কিন্তু তাঁরা ত ভেতরের কথা জানেন না। দ্বিতীয় issue দেখে তাঁদের মত ফিরবে ব'লেই আশা করি। 'ভারতবর্ষ' প্রথমে বিপুল আয়োজন ক'রে, দ্বিজু বাবুর সম্পাদকতায় বার হবে শুনে আমাকে অনেক সম্পাদকই লিখেছিলেন, যে "আমাদের সংহার করবার জন্য ভারতবর্ষের উদয় হচ্ছে", তাদের শাপ সম্পাতেই দ্বিজু দাদা মারা গেলেন—অত দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ তাঁর সইল না। এখন সেই সম্পাদকেরাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কি করবে কপাল! দ্বিজুদা একটা বছর বাঁচলেও ভারতবর্ষ অক্ষয় হয়ে যেত তা নিশ্চয়! এখন এর stability সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা হয়। পাছে লোকে ক্রমশঃ মনে করতে থাকে not worth paying Rs 6 এই ভয়।

প্রমথ, আমিও একটা নাটক লিখ্‌ব ব'লে ঠিক করেছি। যদি ভালো হয় (হবেই!) কোনো theatreএ প্লে করিয়ে দিতে পার? আজ এই পর্য্যন্ত।—তোমার শরৎ

১৫

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 17. 7. 13.

প্রমথ, তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুশী হইলাম। আগেকার পত্রে তোমার যেন একটা রাগের ভাবই আমার চোখে পড়িত, এবার দেখিতেছি সেটা গিয়াছে। তুমি শান্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াছ। আমি মনে করিয়াছিলাম ভায়া আমার এবার ক্ষেপিয়া না গেলে বাঁচি। যাহোক ভালয় ভালয় যে সামলাইয়া গিয়াছ তাহা বড় সুখের কথা। আজ সুরেনকে দেবদাস পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিলাম। কিন্তু, কোন কাজে আসিবে না ভাই। ঐ বইটা একেবারে মাতাল হইয়া, বোতল বোতল খাইয়া লেখা। লেখাগুলো পর্য্যন্ত আঁকাবাঁকা। যা মনে আসিয়াছিল তাই লিখিয়াছি।

আচ্ছা আশ্বিনের জন্য আমি একটা গল্প দিব, নিশ্চিন্ত থাক। তবে, হয়ত একটু বড হইবে। ২০।২৫ পাতার কম নয়। তবে, এমন গল্প এ বৎসর আর বাহির হয় নাই তেমনি করিয়া লিখিব। পূজার সংখ্যায় আমার জন্য ২০।২৫ পাতা ভারতবর্ষের খালি রাখিয়ো। তবে, tragedy লিখিব না। Tragedy ঢের লিখিয়াছি আর না। তা ছাড়া, ছেলে-ছোকরারা tragedy লিখুক, আমাদের এ বয়সে tragedy লেখা কালি কলমের অপব্যয়। আর, ইংরিজির তর্জ্জমা করা লিলি-টিলি আমার আসে না। খাঁটি দিশি জিনিস, একেবারে indigenous goods। চাই ত ব'লো। আর ইংরিজির ছাঁচে ঢালা তাও চাও ত লিখো। এ রকম ইংরিজি ধরণের গল্প লিখ্তে

পারি নে যে তা নয়, তবে লজ্জা করে। যাক। সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক তাই। সমাজপতির মত স্পষ্টবাদিতার ভাণ ক'রে গালিগালাজ করা সত্যই ভাল নয়। তবে, তুমি যা বল্‌ছ গুণের কথাই বল্‌ব, দোষ দেখাব না এটাও ঠিক নয়। দোষ দেখাব, কিন্তু, বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত। যেন সে নিজের দোষটা দেখ্‌তে পায়। তা না ক'রে ঐ রকমের সমালোচনা—"অত্যন্ত কদর্য্য!" "কিছুই হয় নি" "পণ্ডশ্রম" "কালিকলমের অপব্যবহার" ইত্যাদিকে সমালোচনা বলে না। কোথায় দোষ করিয়াছি, কোথায় ভুল হইয়াছে যদি যথার্থ বলিয়া দিয়া লেখকের উপকার করিতে পার ত কর, না হইলে ও-রকম ওপর-চালাকিতে কায হয় না, শুধু শত্রু বাড়ে। পুস্তকের সমালোচনা এমন করিয়া করা উচিত, যেন সেই সমালোচনাটাই একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ হয়। যেন সেইটাই একটা পড়বার জিনিস হয়।

তোমার চিঠিতে ফণির অসুখের অবস্থা শুনে ভয় পেয়ে গেছি। সুরেনও ঠিক ঐ কথাই লিখেছে। বাস্তবিক ফণির অসুখে যদি 'যমুনা' বন্ধ হয়ে যায় সে ত বড় দুর্ঘটনা। আমি ঐ কাগজখানিকে বড় করিবার জন্য যে কত আশা করিয়া আছি তাহা আর কি বলিব। যদি তাহার changeএ যাওয়াই উচিত হয় ত তাই পরামর্শ দাও না কেন? দুই এক মাস ভাগলপুর কি মোজাফ্‌ফরপুরের মত যায়গায় গিয়ে থাক্‌লে বোধ হয় দেহটা শুধরে যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কাগজটা চালাবে কে? তবে তুমি যদি একটা কিছু উপায় ক'রে দাও ত হতে পারে বোধ হয়। বেচারী একা, অথচ, এটুকু কাগজের জন্য লোক রাখাও যায় না, সমস্তই একা করতে হয়, বড় মুস্কিল।

আমার চাকরির চেষ্টা কচ্চ শুনে খুশী হলাম। সাহিত্যচর্চ্চা ক'রে পেট ভরে না ভাই। তাছাড়া, ধর যদি এক মাস কিছু নাই লিখ্‌তে পারি, তা হ'লেই ত বিপদ। অত সংশয়ের পথে পা বাড়াতে ভাল বোধ হয় না। যাহোক মনে কচ্চি পূজোর পর দু-এক মাসের ছুটি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। সেই সময়ে মিত্তির মশায়ের সঙ্গেও দেখা করব। কিন্তু সেখানে চাকরি করতে আমি নারাজ। শুনি হাড়ভাঙা খাটুনি—মাইনে কম। কে ঐ কম মাইনের জন্য হাড়ভাঙা খাট্‌বে আর তাতে সাহিত্যচর্চ্চাও বন্ধ হবে। সে আমি পারব না।

ভাল কথা। এবার 'সাহিত্যে' "দাদা" ব'লে একটা গল্প পড়েছ? কি ভীষণ লেখা। সবাই জানে অকৃতজ্ঞতা বাজারে আছে, তাই ব'লে কি ঐ রকম ক'রে লেখে? ওতে কার কি উপকার হবে? সমস্তটা প'ড়ে একটা বিতৃষ্ণার ভাবই আসে, মন উঁচু হয় না। ওকে সাহিত্য বলা যায় না—ঐ গল্পই আবার সাহিত্যে বার হ'ল। ওর চেয়ে তোমাদের আষাঢ়ের ঐ দর্পচূর্ণ গল্পটি ঢের ভাল। মনের মধ্যে শেষে একটা আহ্লাদ হয়, আমি ঠিক ঐ রকমই আজকাল ভালবাসি।

তোমার বায়স্কোপ দু-বার পড়েছি। অনেক জিনিস যা জানতাম না জানা গেল। আর ঐ যে ছোট ছোট পাস্তয়ার ইতিহাস প্রভৃতি ওগুলি সবচেয়ে ভাল। কত ছোটখাট দরকারী ঘরের কথা যে ওতে জানা যায় তা' ব'লে শেষ করা যায় না। ঐ রকম যেন প্রতি বারে থাকে।

আর না, মেল ক্লোস হয় হয়—

ভাল আছি।—শরৎ

প্রাণধন বাবু কি আমাকে আর মনে করেন? হয়ত ভুলে গেছেন, না? আমি তাঁকে কিন্তু প্রায়ই মনে করি। অতি অল্প দিনের আলাপে তাঁর উপর আমার একটা বোধ করি স্থায়ী আকর্ষণ হয়ে আছে। অবশ্য এ সব কথা তিনি যেন না শোনেন—হয়ত তা হ'লে কি মনে করবেন। তোমার বাড়ীর খবর লেখ না কেন?—শ

১৬

14 Lower Pozouugdoung Street
Rangoon

[ডাকমোহর ২৫ জুলাই ১৯১৩]

প্রমথ, তোমাদের প্রেরিত 'ভারতবর্ষ' ও তোমার পত্র উভয়ই পাইয়াছি। কাগজখানির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এবারকার কাগজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। "বিন্দুর ছেলে" তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধ হয় ওটি মন্দ হয় নি, কেন না, অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে "রামের সুমতি"র চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি। প্রায় "পথনির্দ্দেশে"র কাছাকাছি। পূজার সংখ্যার জন্য আমার সাধ্যমত একটি গল্প লিখিয়া পাঠাইব—কিন্তু, প্রকাশ করিবার জন্য কাহাকেও অর্থাৎ সম্পাদক-যুগলকে খোশামোদ করিও না। আমার শপথ রইল। কেন না, তোমার ভাল লাগিলেই তাহা যে তাঁহাদের ভাল লাগিবেই অথবা প্রকাশের যোগ্য হইবে—সে কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। কেন, তাহা পরে বলিব। তোমাদের এবারের কাগজ পড়িয়া গোটা দুই প্রশ্ন মনে

হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ১ম সুরজ কওর সম্বন্ধে। সুরজ কওর বেশ্যা এবং খুনে। হরি সিংকে এক স্থানে বলিতেছে—"এই ত দরশ পরশ হইল! আমি যে কায বলিয়াছি করিয়া আইস তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না।" অর্থাৎ, সোজা বাংলায়, "কাজ ক'রে এলেই তোমার কাছে শোব।" ঠিক কি না? কেন না ইতিপূর্ব্বে, নির্জ্জন ঘরে বেশ্যা সুরজ "হাসিয়া মুখে কাপড় দিয়াছে" এবং "চোখে প্রেমের আহ্বান করিয়াছে" এবং "হরিসিং আঁচল ধরিয়া ওড়না টানাটানি করিয়াছে।" কি প্রমথ, অস্বীকার করিবে সমস্ত গল্পের driftটা কি? অনাবৃত রূপ যে শুধু জানিয়া শুনিয়া মঙ্গলসিংকেই দেখায় নাই—পাঠককেও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে! তাহাতে ছবি দিয়া জিনিসটি বেশ ফুটিয়াছে! সাবাস!! "তবে দেখ! রূপ দেখ!" অনেকেই তাহা দেখিতে পাইয়াছে!

২। ১৯৩ পাতা—"অন্ধকার বৃন্দাবন"। চতুর্থ stanza: "করে না দধি মন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার"। কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধি মন্থ করলে, দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি বেশ ভালই লাগে। চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের স্ত্রীটিও 'দধি মন্থ' করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না ব'লে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখ্‌ছি! ভট্টিকাব্য না কোথায় এই কথাটা আছে না? কিন্তু এ ভট্টির দিন নয়—ইংরাজের রাজত্ব। আমি সময়াভাবে সব কাগজটা পড়ি নি—প'ড়ে বলব। এই কবিতাটির তৃতীয় stanza—"যমুনা জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম

চন্দ্রমার"। শ্যামচাঁদটি তখন কোথায় শুনি? বোধ করি মথুরা থেকে Bagpipe বাজাচ্ছিলেন, না হ'লে অত দূরে বৃন্দাবনের যমুনা জল শিহরে কি ক'রে? অত দূরে আর একটা জেলা থেকে বাঁশী বাজালে? তবে, দেবতার কথা বলা যায় না, ওঁরা জাহাজের বাঁশীর মত ইচ্ছা করলে বাজাতে পারেন। সম্ভব বটে! ৪র্থ stanza—"যায় না চুরি নবনী ক্ষীর, বলিয়া ফেলে অশ্রুনীর"—ক্রিয়া আছে ছত্রের কর্ত্তাটি কি? আর একটা কথা ভাই। ছেলে-ছোকরায় গল্প লিখলে ধরি নে। কোকিলেশ্বরের "ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ" বাপ রে! যা হোক, ১৬ এবং ১৮ লাইনে লিখছেন, "দেবতাবর্গ" দেবতৃ শব্দের ষষ্ঠি কি হয় পণ্ডিত মশাইকে জেনে ব'লে দেবে ভাই? যদি দেবতাবর্গই হয়, 'দেবতৃবর্গ' না হয় (বাঙলা ব'লে) তবে এবার থেকে যেন 'পিতাকুল' 'মাতাকুল' লেখেন। পিতৃকুল ইত্যাদি লেখেন না। কই বার কর দেখি এমনি লেখা। অক্ষয় মৈত্রের কিম্বা বিজয়বাবুর প্রবন্ধে? তোমাদের কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ সম্পাদকের কি এটাও নজরে পড়ে না? যদি নাই পড়ে, ত অত বেদ বেদান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া ঠিক নয়। দুটো একটা ভুলও আছে। যথা "মাসিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বৈশাখ" ২৯৪ পাতা। গল্প ও উপন্যাস—"রামের সুমতি"—কিন্তু "রামের সুমতি" ফাল্গুন ও চৈত্রে বার হয়েছিল। অর্থাৎ গত বৎসরে। বৈশাখের 'যমুনা'য় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না—তাতে "পথ-নির্দ্দেশ" আর "নারীর মূল্য" ছিল। নিশ্চয়ই কোনটা উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে না, অবশ্য সে জন্য আমি দুঃখ করছি নে কেন না তাঁর কথার মূল্য আমার কাছে অতি অল্পই। কিন্তু ভাবছি 'অজ্ঞাতবাস' ফকির বাবুর

বইয়ের মত আমার কোন একটা বই যদি থাকৃত আর বিদ্যাভূষণ তাঁর হতেন প্রকাশক—তা হ'লে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য হ'ত। "রত্ন-দীপ" নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কেন না, নায়ক রাখাল পরস্ত্রীর সতীত্ব হরণ করবার মানসে যাত্রা করেছেন এবং 'মানসী'তে বার হচ্ছে। হায় রে দ্বিজুদার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ'। "সাহিত্য সমালোচনা"র মধ্যে পাঁচকড়ির 'নববর্ষ'ও উল্লেখযোগ্য! যার দুটো ছত্র consistent নয়। "তারে জোর ক'রে শ্যামের বাঁশী" আর "আমার মরণ হ'ল না" আছে কি না! 'নববর্ষ' প'ড়ে দেখো—এমন এলোমেলো গাঁজাখুরি jargon আর সম্প্রতি দেখেছি কি না মনে হয় না। আরো একটু মন দিয়ে 'ভারতবর্ষ' পড়ি, তার পরে 'আশ্বিন' সংখ্যায় "সাহিত্যে" একটি বিরাট সমালোচনা লিখব। সমাজপতিও কিছু লিখে দেবার জন্য ঘন ঘন registered letter এবং telegram পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথাটাও রাখা হবে। প্রমথ ভাই, দোকানদারি দেখতে দেখতে আর অসহ্য খোশামোদ ভণ্ডামি শুনতে শুনতে হাড় কালি হয়ে গেল। সব কাগজই কি এক সুরে বাঁধা? যদি তাই হয়, প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজুদার নামটা 'ভারতবর্ষ' থেকে তুলে দাও—তার পরে এই রকম অবিচার এবং মানুষকে mislead ক'রো। নারীর মূল্য তাঁরও ভাল লেগেছিল—দুঃখ হয় শেষটা তিনি পড়লেন না। এতে অনেক সত্য কথা আছে তাইতেই এটা প্রবন্ধের যোগ্য নয়। যাক্। যথার্থ সুখও পেয়েছি। 'প্রাক্তন' গল্পটি যথার্থই উঁচু লেখা! আর জলধর বাবুর 'দিনাজপুর'টিও মন্দ নয়। 'ঘাটে' ছবিটি বেশ। নোলকটা না থাকলে আরো ভাল হ'ত। 'কানাকড়ি' এখনও পড়ি নি। এই

অবনীন্দ্র ঠাকুরের ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোনদিন করি নি। Art' painting আমিও নিজে করি। Oil-painting আমিও বুঝি—ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়ি নি—কিন্তু 'যমুনা' ছোটো কাগজ ওতে সুবিধে হবে না। তা ছাড়া 'অনিলা দেবী' নাম নিয়ে সমালোচনা করতে আর ইচ্ছা করে না। আমাদের ফণীন্দ্রভায়ার proof দেখার চোটে, আমার লেখার ত ছত্রে ছত্রে ভুল বিরাজ কচ্ছেন—বিপক্ষ সেইগুলো তুলে ধরলেই ত গিছি! দেখা যাক কি হয়। যাই হোক তোমাকে না দেখিয়ে বা তোমার মত না নিয়ে কিছুতেই প্রকাশ করব না। তবে, আর একটা কথা ব'লে রাখি ভাই। তুমি মনে ক'রো না আমি সেই পুরাতন কথার শোধ তুলছি। চরিত্রহীনের এখন বাজারে অত্যন্ত দুর্নাম, তা সত্ত্বেও আমি সে জন্যে আজকের এই কথাগুলো লিখি নি। কথাগুলো যদি সত্য না হয়, ভালই, যদি সত্য হয়, ভবিষ্যতে সাবধান হ'লেই হবে। এই সুরজ কওরটা আমাদের clubএর সকলেই একবাক্যে নিন্দা করছে। অনেকে এমনও বলেছে ওটা প্রকাশ্য অনাবৃত *immorality*, সত্যিও ওর ছত্রে ছত্রে এই exciting ভাব ছাড়া আর কিছুমাত্র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। যা হোক আমারও একটা নজির হয়ে রইল। চরিত্রহীন প্রকাশ করার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও আমাকে ইতিমধ্যে খুঁজে রাখতে হবে। আমি বিদ্রূপ করলে কিরূপ করি তা জানই—এমনি ক'রে প্রতি ছত্রে প্রতি পাতা তুলে ধ'রে expose করব। আমি অনেক নজির এর মধ্যেই জোগাড় করেছি। রবিবাবু প্রভৃতি সর্ব্বত্র হ'তেই।

হাঁ, আর একটা কথা। সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষে তাকে যেন অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে উপায় করেছি। বড় মন্দ হয় নি প্রমথ। আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ওরকম না হ'লে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু পড়বার জন্যেও উৎসুক হয়ে থাক্‌বে। আমরা এক রকম আশা ক'রে আছি। ওতে 'যমুনা'র পশার বাড়বে। নইলে দেখছি ত ভাই, এই সব খবরের কাগজে ফেকাসে, রক্তহীন উপন্যাস বেরিয়েই য'চ্ছে—কেউ পড়ে না। ঐ 'ভারতী'র বাগ্‌দত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি—অরণ্যবাস—বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগার খাটা গোছ। অথচ রত্নদীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের "মন্ত্রশক্তি"! ঐ পুরুত, আর মন্দির আর ঐ সব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না—অপরের কথা কি বলব ভাই, আমি এখনো পড়ি নি। অথচ আমার এই ব্যবসা।

দেখ না লেখবার কায়দা, বঙ্কিমবাবু রবিবাবুর। প্রথমেই একটা something! যাই হোক দেখাই যাবে। আমার ছেলেবেলার 'চন্দ্রনাথ'টা কি জানি কেউ পড়েছে কি না! ওটা আমার দেবার ইচ্ছেই ছিল না। ঐ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ক্রমশঃ হ'লে লোকের patience থাকে না। তা যতই শেষে ভাল হোক্। কেমন আছ, বাড়ীর খবর লেখ না কেন?—শরৎ

মনে হয় প্রমথ, নিজের একটা কাগজ থাকত ত, বাক্যবাণে এই তথাকথিত পণ্ডিতগুলির চৈতন্য করিয়ে দিতাম। কতক বলে সমাজপতি,

কিন্তু তার বলায় কোন ফল হয় না। কেন না, তার অনেকটাই শুধু গ্লানি আর গালিগালাজ—প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। তাতে আওয়াজ থাকে কামানের মত, কিন্তু ভেতরে একটা ছররাও থাকে না। তাই লোকে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আমি Jack of all trade কি না, সঙ্গীত, চিত্র, দর্শন, কাব্য, নাটক, নভেল, সব বিষয়েই এক ফোঁটা এক ফোঁটা জানি, তার উপর নির্ভর ক'রে মনের সাধে 'যুদ্ধং দেহি' ক'রে দিতাম। হাঁ হাঁ—আমি উদাসীনও বটে, গৃহীও বটে। চোখ বেশ ক'রে খুলে রাখলেই দেখা যায়। দেখতে তুমিও পার, আমিও পারি, কিন্তু মনে রাখা চাই। আমি মনে ক'রে রাখি, তোমরা ভুলে যেরে দাও—এই প্রভেদ আর কিছু নয়।

১৭

Rangoon
9. 8. 13

প্রমথ, তোমার চিঠি যেদিন পাইলাম তার পরদিন manuscript পাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া দিয়া পাঠাইতে গেলে আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম ২৩।২৪ শ্রাবণের আগে পৌঁছিবে না, সেই জন্যে ভাদ্রে কিছুতেই ছাপা হইবে না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইলাম না। এমন কোন অর্থ নাই যে পরের মাসে না বাহির হইলে আর উত্তর দেওয়া চলে না। ওটা আশ্বিনে ছাপাইলেই হইবে। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবারও আছে। প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে এবং এমন সব কথা আছে যাহা 'ঝগড়া,' ওটা উচিত কিনা সন্দেহ। আমি ঐ কথাগুলাই

আর একটা কাগজে লিখিয়া আশ্বিনের জন্য পাঠাইব মনে করিয়াছি। তবে, আক্রমণ করিতেই হইবে এবং তাহা একটু polite ধরণে—অনেকটা কানকাটার মত করিয়া। আশা করি ইহাতে তুমি মনে কিছু করিবে না। যাহা ভাল হইবে, নিশ্চয় তোমার জন্য তাহাই করিব। তা ছাড়া দেখ, গৃহস্থ কি বলে? দুঃখ এই যে আমি ওঁর original painting দেখি নি তাহা হইলে এমন বলা বলিতাম যে তিনি বুঝিতেন এ কোন চিত্রব্যবসায়ীর লেখা—যার তার নয়। আমি তোমার জন্য গল্প লিখিতেছি অর্থাৎ দু-দিন লিখিয়াছি আর দু-দিন লিখিব। ছবি দেবে কি হে? দোহাই প্রমথ, আমার গল্পের ভেতরে ছবি দিও না—ওরে বাপ্ রে! সেই "ফুলগাছ" আর সেই ব্যথিতের মৃত্যুশয্যা। আমি তা'হলে লজ্জায় বাঁচব না। তাছাড়া আশা করি, ছবি আমার গল্পে না দিলেও লোকে পড়বে। ১ হপ্তা পরে পাঠাব। তুমি সমাজপতির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, ফণি তার চেয়েও বেশী করিয়া লিখিতেছে—অথচ সমাজপতি মহাশয়ের কালকের রেজেষ্ট্রী পত্র এই সঙ্গে পাঠালাম পড়িলেই বুঝিবে, কি মুস্কিলে পড়িয়াছি। কি যে করি ঠিক করিতে পারি না, অথচ, আমার হাতেও গল্প লেখা নাই, মগজেও আসিতেছে না। তার ওপর আফিসের কাজ এত বেশী এই মাসটায় পড়িয়াছে যে রাত্রি সাতটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতে পারি না। তার পরে লেখাপড়া, বিশেষ, মাথার ভেতর থেকে কিছু বার করা প্রায় অসাধ্য! তবে আমার না কি বড় শক্ত মাথা তাই এত ঘা খেয়েও কিছু কিছু ঠুকলে ঠাকলে বার হয়। সকালে আজকাল আবার আরো বিপদ—লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না

গেলে, যিনি আছেন তিনি বলেন "খেতে পাবে না"। ইনি ত দিনরাত জপতপ পুজো আচ্চা নিয়েই থাকেন, একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে কিন্তু কাজে আসে না। এক দিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে ব'লে যাই তুমি লিখে যাও—স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু, সুবিধা হ'ল না। "বরং" লিখতে জিজ্ঞেস করেন অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ "ং" হবে না "ঃ" হবে? কাজেই আমাকে সমস্ত নিজেই লিখতে হয়। রাত্রে একটু আফিমের ঘোরও ধরে উঠে, ব'সে লিখতে পারি নে। এ সব কারণেই লেখা এত কম হয়। তাই আর এক কায করেছি প্রমথ, আমি নিজে ত 'যমুনা' চালাতে পারি নে তাই আমার সমস্ত শিষ্যগুলিকে লাগিয়ে দিয়েছি। নিরুপমা, বিভূতি, সুরেন, গিরীন এবং ভাগলপুরের আরো দুই একজন সাহিত্যিক লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। দেখা যাক 'যমুনা'র অদৃষ্টে কি সঞ্চয় হয়। তারা ত বলেছে তুমি গুরুদেব, তোমার কথার আমরা অবাধ্য হব না এবং এই যা আশা। আর একটা কথা সেদিন একটা চিঠি পেলাম (ভাবী সম্পাদক হইতে) 'অয়ন' ব'লে একটা কাগজ ও 'কর্ম্মক্ষেত্র' ব'লে আর একটা কাগজের জন্য তারা বিশেষ লোভ দেখিয়ে পত্র দিয়েছেন—কিন্তু লোভ দেখালে কি হয়? আমার পুঁজি কই? আমি ত আর সত্যেন দত্ত নই যে বল্‌লেই কবিতা লিখে ফেল্‌ব! শুনছি 'অয়ন' পত্রিকা আমার "কোরেল" গল্পটা সুরেনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে—তবে বেনামি ছাপাবে এ সর্ত্ত বুঝি তার সঙ্গে হয়েছে। সেটা না কি ভাল গল্প। কি জানি, আমার ভাল মনেও নেই। আচ্ছা, আজকাল হুহু শব্দে এত মাসিক পত্রের

আয়োজন হচ্ছে কেন? এটা কি খুব লাভের ব্যবসায়? একে ত খোশামোদ ক'রে ক'রে প্রাণ অস্থির তার পরে ঐ যে লিখেছ, এতটুকু স্বাধীনতা নেই। আমার গল্পগুলো বই ক'রে ছাপিয়ে কি হবে? কে কিনবে? কত গল্পের বই রয়েছে আমার বই কি কেউ পড়বে? আমার নষ্ট করার মতো টাকা নেই—ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া হাঙ্গামা কত, advertise কর, ক্যানভাস কর, লোকের opinion সংগ্রহ কর—ও সব আমি চাইও না পারবও না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে পেলে বাঁচি।. অত হৈ চৈ কে করবে? আমার ত সাধ্য নয়। প্রমথ, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলি। এত দিন এ কথাটা আমার মনে ওঠে নি। এত বড় বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ Sub-Editor কি কিছু একটা করে না? অনেক কাজ তাদের ক'রে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা এও আমিই দিতে পারব। তাছাড়া, ছবি judge করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনা এও, (আর কিছু ভাল না জুটলে) আমি ক'রে দেব। ১০টা থেকে ৪॥৫টা পর্য্যন্ত খাটলে আমি খুব পারি। অবশ্য তাম্রলিপ্তি টিপ্তি পারব না। তার পরে এখন যেমন সকালে ও রাত্রে নিজের কায করি তখনও করব। দেখো ত যদি কেউ আমাকে নিতে স্বীকার করে। একজন ভাল Editor থাক্‌লেই আমি কায চালিয়ে দেব। অন্ততঃ ছিছি কাগজ কোন মাসেই হ'তে দেব না এ assurance তুমি আমার হয়ে দিতে পার। এ চাক্‌রি আমার খুব ভাল লাগ্‌বে তবে যদি টিকসই হয়। এমন না হয় দু-দিন পরেই বলে,

তোমাকে চাই নে যাও। এর মধ্যে যদি কোন কাগজ বার হবার কথাবার্ত্তা হয় আর তোমার চেনা-শোনা থাকে তাহ'লে চেষ্টা দেখো— আমার বর্ম্মা আর পোষাচ্ছে না। দেশ দেশ মন কচ্ছে। সমাজপতির সম্বন্ধে কি পরামর্শ দাও? তোমার মত ছাড়া আমি কিছুই করব না। কিন্তু বিপদেও বড় পড়েছি তা বোধ করি বুঝতে পাচ্ছ। সমাজপতি সম্বন্ধে কি করা উচিত অতি সত্বর জবাব দিয়ো। আব চিঠিটা হারিয়ো না, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো কেন না, এক সময়ে যখন আমার নিন্দে সুরু করবে তখন কাযে আসতে পারে। Documentary evidence! আজ রাত্রে কিছুই হ'ল না কেবল চিঠিই লিখছি।—শরৎ

১৮

14 Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 18. 8. 13

প্রমথ, আজ তোমার পত্র পাইয়া অনেক কথা জানিলাম। ইতিমধ্যে আমার এক মহা বিপদ ঘ'টে গিয়েছিল। একটা দাঁত (কসের) প্রায় তিন চার বছর থেকেই নড়ে। ১০।১২ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাতে যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। একটু একটু নড়ে কি না, তাই নাড়ালে একটু আরাম পাই। উনি পরামর্শ দিলেন, খুব ক'রে নড়াও, যদি ভিতরে বদ রক্ত থাকে ত বার হয়ে যাবে। তখন সেই ভাবে তাকে ঘণ্টাখানেক বেশ নড়ানো গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সকাল বেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারি নে। তার পরে সে কি যন্ত্রণা!! সে দিন রাত যে কি ক'রে গেল তা শুধু ভগবানই জানেন। পরদিন

Dentistএর কাছে গেলাম, তিনি বল্‌লেন উপড়ে ফেলে দিতে হবে। উনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন, বল্‌লেন "ওরে বাপ রে! একটি দাঁত তুল্‌লে সব কটি দাঁত দু-দিনে ঝুর্‌ ঝুর্‌ ক'রে প'ড়ে যাবে" এবং বেশ একটু scientific ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে —অসময়ে তুললেই আর রক্ষে থাক্‌বে না। সাত পাঁচ ভেবে চ'লে আসা গেল, তার পর জ্বর। বুঝতেই পাচ্ছ কি কাণ্ড হচ্ছে। আর সহ্য হ'ল না, তার পরদিন তুলে এলাম। সে যা Dentist! প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধ'রে প্রায় আধ-ওপড়ানো-গোছ ক'রে তুলেছিল। যত বলি ওটা না ওটা না সায়েব থামো থামো—সে ততই বলে সবুর কর আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তার পর নড়া দাঁত ওপড়ানো হ'ল। ওপড়ানো ত হ'ল—কিন্তু রক্ত থামে না। Dentist বল্‌লেন, "বাবু, তোমার দাঁত বড় খারাপ।" কথা শোন প্রমথ! তুই শালা তুল্‌তে জানিস নে—রক্তপড়ার দোষ হ'ল আমার দাঁতের! যা হোক এমনি ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর রক্ত বন্ধ ক'রে বাড়ী ফিরে এসে আবার জ্বর! আজো সেরে উঠতে পারি নি। ৮।১০ দিন লেখাপড়া আফিস সমস্ত বন্ধ! না হ'লে তোমাদের লেখাটেখাগুলো শেষ হয়ে যেত। যাহোক তাড়াতাড়ি ক'রে এইবার লিখে পাঠাব। ভেবো না। আমার ঐ তিনটা গল্প বই ক'রে ছাপানো সম্বন্ধে আমার আপত্তি নেই, যদি না কিছু ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। হাঁ বিক্রী হবে ব'লেই মনে হয়, কারণ এর মধ্যেই অনেকে জান্‌তে পেরেছেন। তুমি যেমন ক'রে ছাপতে বল্‌বে তাই হবে—শুধু ছবি দেওয়া হবে না এইটি আমার অনুরোধ।

Copyright বিক্রী করতে চাও কর, না করতে চাও ক'রো না—যা তোমার খুশী, আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম, এ সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবারও আবশ্যক নাই। তবে, এই আশ্বিনে 'ভারতবর্ষে' যে গল্পটা বার হবে সেইটে নিয়ে চারটে একসঙ্গে ক'রে ছাপালেই ভাল হয় বোধ হয়। Copyright বিক্রী করে যদি টাকা পাই ত H. Spencerএর বইগুলো কিনে ফেলি। যাহোক যা হয় ক'রো। আমার চাকরি ছাড়ার এত আবশ্যক নাই—ছুটি নিয়ে যাই—দেখি শুনি তার পরে যা হয় করা যাবে।

সমাজপতিকে চিঠির জবাব দিয়ে দিয়েছি। এই রকম লিখেছি যে আপনি চতুর্দ্দিকে advertise করেন তাতে প্রসিদ্ধ গল্পলেখক এবং চমৎকার গল্পলেখক দীনেন্দ্র বাবু, প্রভাত বাবু, সরোজনাথ প্রভৃতির উল্লেখ করেন কিন্তু আমার কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকায় মনে করি আপনার মত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমজদার ও সমালোচক যখন আমার গল্পের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন না তখন নিশ্চয়ই আমার গল্প ভাল নয়। এই সঙ্কোচেই আমি আপনার প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখিতে ভয় পাই এবং ভবিষ্যতেও পাইব।

এখনো ত জবাব পাই নি। পেলে জানাব। বাস্তবিক লোকটি সহজ নয়। শুনলাম 'যমুনা'র বিনিময় বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। যত আক্রোশ তাঁর 'যমুনা'র উপর। অথচ, তিনি যমুনাখানি আগ্রহে পড়েন।

আজ আর না, রাত্রি ১৷৷৹টা, শুইগে।—তোমার শরৎ

১৯

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon

[ডাকমোহর ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৩]

প্রমথনাথ, আজ তোমার চিঠি পেলাম। কন্যার জন্ম হয়েছে শুনে বড় খুশী হলাম। এই দুটি বেঁচে থাক—আর আবশ্যক নাই। জ্বর জ্বর হয়েই আছে। ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছি, পড়াশুনো একেবারে থামিয়েছি। কেন না, আমার এ বিষয়ে নেশার মত ঝোঁক ধরে। একবার সুরু করলে মোটেই moderation থাকে না, হয়ত রাত্রি ৩।৪ হয়ে যায়। হাঁ, নারীর মূল্য ও চন্দ্রনাথ দু-ই এইবারে শেষ হয়েছে। আমি তোমাকেও সময়ে গল্প পাঠাতে না পারার জন্য লজ্জায় তোমাকে চিঠি দিতেই পারছিলাম না। যাহোক শুন্‌লাম প্রভাত বাবু প্রভৃতির গল্প পেলে আর তাড়াতাড়ি নাই। তাছাড়া, পূজার সংখ্যায় ওঁর গল্প দিয়ে আবার আমার গল্প দেবার স্থান সঙ্কুলানও হয়ত হ'ত না। হাঁ ঐসব গল্প বই ক'রে ছাপার জন্য কিছু কিছু সংশোধন ক'রে দিতে হবে, কেন না বিস্তর ছাপার ভুল, sentence লোপ প্রভৃতি দোষ আছে। ভাই প্রমথ, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলি। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার আর বেশী দিন নেই। হয়ত বা এই বছরটাই শেষ বছর। যদি হঠাৎ সরি ভাই, মনে-টনে রেখো। তুমি ছাড়া আমার বোধ করি আর বন্ধুই নেই—কত যে তোমাকে ভালবাসি, তা একটু পূর্ব্বেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখছিলাম। যাক্ এ সব মেয়েলি

দুঃখের কথা—যেতে হয় যাওয়া যাবে। তবে আর একবার যেন দেখা হয় এইটাই মনের শেষ সাধ। গেলে তোমার ওখানেই থাকব। মরি ত সদ্গতি হবে—বামুনের কাঁধে চ'ড়ে পরম মিত্রের মুখ দেখে, শেষ সেবা নিয়ে, নিমতলায় যাওয়া যাবে। কেমন? আমার কতটুকু ক্ষমতা ভাই, কিবা জানি, মাতৃভাষা আমার কাছে আর কি আশা করে? শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখতে কষ্ট হচ্ছে—একটু জোর পেয়ে সব কথা ভাল ক'রে জবাব দেবো। প্রাণধনকে আমার কথা ব'লো। আর একটা কথা—'বিন্দুর ছেলে' গল্পটার অত্যন্ত সুনাম হয়েছে। অনেকের মত এইটাই best. অনেকের মত 'পথনির্দ্দেশ,' অনেকের 'রামের সুমতি'। ভাবি equally intelligent লোকেদের মধ্যে এ রকম মতভেদ হয় কেন? এমন সংবাদও পেয়েছি যে 'পথনির্দ্দেশ'টা immoral!! ভাদ্রের 'যমুনা'য় দ্বিজুদার সম্বন্ধে একটি কবিতা বেরিয়েছে—ভারি সুন্দর। ভাদ্রের 'ভারতবর্ষ' পাই নি। বোধ করি তাঁরা পাঠাতে ভুলেছেন কিম্বা হয়ত officeএর ঠিকানায় পাঠিয়েছেন, কেউ মেরে দিয়েছে। যাই হোক সে কথা কাউকে জানাবার আবশ্যক নেই—তোমার কপিটা পাঠিয়ে দিয়ো, একবার প'ড়ে ফেরত পাঠাব।

দিদির সম্বাদ এখনও পেলাম না সেজন্য ভেবে ভেবে আরো যেন শরীর খারাপ হয়ে উঠেছে। সেখানে telegraph যায় না—চিঠির জবাবও পাচ্ছি না। সমাজপতির সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক সেই জবাবই পেয়েছি। আমিও বুঝেছি ব্যাপারটা কি হ্যাণ্ডবিলও একখানা ফণি পাঠিয়েছিল—বাস্তবিক মিথ্যে কথা এমন নির্লজ্জভাবে বলছেন

যে, যে পড়ে তারও লজ্জা করতে থাকে। আমি তাঁকে কিছুতেই 'লেখা' পাঠাব না, কারণ তিনি তোমাদের শত্রু তার উপর সুবিধার লোক নন।—তোমার শরৎ

২০

30. 9. 13

প্রমথ, আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমার বাড়ীর খবর শুনে বড় চিন্তিত হয়ে থাকলাম, অতি শীঘ্র ভাল সম্বাদ দিয়ো। আপাততঃ একটু ভাল ক'রে ঘরের দিকে মন দাও, পরের কাজ দু-দিন পরে করলেও চল্‌বে। বৌঠানের আবার কি হ'ল? বাহিরেই বা যাবে কেন? কলকাতায় থাকতে পেলেই ত লোক বেঁচে যায়—তুমি ছেড়ে যেতে চাও কেন? না, আমি পূজার সময় যাব না। যেতাম শরীর ভাল থাক্‌লে। অসুস্থ থাকা পর্য্যন্ত কারু কাছে কিছুতেই যাব না। ও আমার ভারী লজ্জা করে। সারলেই পালাব নিশ্চয়।

গল্পটা খানিক লিখেছিলাম—কিন্তু তোমার এম্‌নি নামের মহিমা যে সেটা একেবারেই কদাকার হয়ে উঠছিল; শেষ না হ'লে কোনমতেই বলা চলে না ছাপার উপযুক্ত কি না! যদি দেখি ভাল হয় নি, তোমার নামে ছাপতে হবে। অগ্রাণে ছাপা হ'লেই ভাল হয়—আমিও দু-দিন বিশ্রাম করি। অর্থাৎ পড়া লেখা যেমন বন্ধ ক'রে আছি, তেমনিই থাকি! তবু তোমাদের কিছু সত্যিই আর আটকায় না, কিন্তু যে বেচারার সত্যিই আটকাচ্ছে তার জন্যেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। লিখি নে বটে, কিন্তু ভাবতেও ছাড়ি নে। সেটা ভাল ভাবনা নয়,

নিতান্তই দুর্ভাবনা। আমি ছাড়া সে বেচারার আর প্রায় কোন সম্বলই নেই। তবে, বুড়িকে একরকম পরওয়ানা জারি ক'রে দিয়েছি যে, 'যমুনা'কে বিশেষ সাহায্য করতেই হবে। সে আমার হুকুম কোন কারণেই অমান্য করতে পারে না, সেই ভরসা। তা হ'লে কি হয়, সে বেচারাও প্রায় মুমূর্ষাগত। আমার নারীর মূল্যও শেষ হ'ল; বিস্তর সুখ্যাতি ক'রে অনেক পরিচিত অপরিচিত লোকেরই এ সম্বন্ধে চিঠি পেলাম—কিন্তু ভাব্‌ছি লোকে আমার নাম জান্‌লে কি ক'রে? হয় ফণির দ্বারা, না হয় তোমার দ্বারা এই অনিষ্ট ঘটেছে। এবার কি সুরু করি বল ত? দশটা মূল্যের, বেশ্যার মূল্য আর নেশার মূল্য যা বোধ করি সবচেয়ে interesting হ'ত, তাইতেই বন্ধু বান্ধবের ভীষণ আপত্তি। তারা কিছুতেই রাজী নয় যে আমি এ দুটো দিদির নাম দিয়ে লিখি। মনে করেছি Evolution of idea of God কিম্বা Evolution of idea of Soul সুরু করব। অবশ্য ঠিক নারীর মূল্যের ধরণেই। তুমি যা বল, তাই করব। আমি তোমাকে অনেক অপদস্থ করেছি, আমার সব মনে আছে—একটু ভাল হই, তার পর দেখা যাবে যদি শোধ করতে পারি। আমার ব্যবহারে তুমি যত ক্ষুণ্ণই হয়ে থাক না কেন, এক দিন এটা যাতে ভুলতে পার, সে কথা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলি না। চিঠির জবাব একটু তাড়াতাড়ি দিয়ো। বড় ভাল নই।—তোমার শরৎ

পুঃ—চন্দ্রনাথ তোমার ভাল লাগবে তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, কেন না ওটা আমার ভাল লাগে নি। একে ত ছেলেবেলার লেখায় স্বভাবতই অপূর্ণতা বেশী, তাতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস র'য়ে গেছে। এই

উচ্ছ্বাস বস্তুটিতে আমার ভীষণ ভয়। যাই হোক পাঁচ জনের ভাল লাগলেই ভাল। তবে ভাষাটা খুবই সরল—বোধ করি আশ্চর্য সরল এবং direct এটা অস্বীকার করা যায় না।

২১

14, Lower Pozoungdoung Street.
Rangoon, 22. 10. 13

প্রমথ, তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ চিন্তিত হলাম। এখন অন্য সব আলোচনা আমার সত্যই ভাল লাগে না। তোমার বাড়ীর খবর একটু একটু ক'রে জানাবে। বো'ঠান কেমন আছেন, এবং কি রকম ব্যবস্থা কবছ শীঘ্র লিখে চিন্তা দূর করবে। তোমার পিসীমা যখন ভাল হবেন, এবং অন্য খবর সব মঙ্গল ব'লে লিখতে পারবে তখন আমিও আমার সম্বন্ধে আলোচনা করব, এখন নয়। হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা করতে বিলম্ব ক'রো না।

যা হোক দুটো কথা জানাবার আছে। 'যমুনা' সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ—noted.

দ্বিতীয়, তোমার জন্যে যেটা লিখতে লিখতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেটা শেষ হ'ল। নিতান্ত মন্দ হয়নিই ব'লে মনে হচ্ছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মস্ত বড হয়ে গেল—দুয়ের বার হয়ে গেছে। 'বিন্দুর ছেলে'র দেড়া বড় হয়েছে, কি উপায় করি? আবার তাড়াতাড়ি আর একটা লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছি। তুমি যদি বল তোমার উত্তর পাওয়া মাত্র ঐ বড়টা registry ক'রে পাঠাতে পারি।

তোমাকেই পাঠাব কেন না তোমার জন্যে লেখা—যা খুশী করতে পার।

'মূল্য' 'টুল্য' সুরু করেছি বটে, এগোচ্ছে না। কারণ শরীর সারলেও বেশী চাপ দিতে সাহস হয় না। না, ওগুলো ফাঁকিতে সারা য় না।

তোমাদের 'ভারতবর্ষ' যে রকম উন্নতি করেছে বাস্তবিক বড় সুখের বিষয়। কিন্তু, আমি ত সত্যই ভেবে পাই না এত উন্নতির হেতু কি? ইন্দ্রজাল তোমরা জানো বলতে পারি না। এক একবার ভাবি দ্বিজুদা বেঁচে থাকলে না জানি কি রকম হ'ত!

তোমার নিজের যা লেখা আছে ছাপাও না কেন? আমি না প'ড়েই বলতে পারি, তা তোমাদের কাগজে শীর্ষস্থানে স্থান পেতে পারবে।

বিভূতির নভেলটা তোমরা ছাপালে ত খুব ভাল হয়। এমন grand বই আমি অনেক দিন পড়ি নি—তাই বা কেন, কোন দিন পড়ি নি। কিন্তু দোষও আছে—সেটা হচ্ছে এই যে arrangementএ গোলমাল আছে ব'লে মনে হচ্ছে—অর্থাৎ chapter আর ঘটনাগুলা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে বসাতে হবে। বস্তু আর ভাব যা আছে তা যথার্থই অতি সুন্দর, যে-কোন কাগজের গৌরবের জিনিস হবে কিন্তু আমার ভয় হয়, arrangementএর এই গোল থাকাতে অনেকেরই প্রথমটা প'ড়েই বিস্বাদ লাগবে। আর এগোতে চাইবে না—শেষ পর্য্যন্ত পড়বে না। আমি পুঁটুর (বিভূতির) চিঠি পেলে তোমাকে অন্য কথা জানাব।—শ.

আমার রামের সুমতি প্রভৃতির কাপিটাপি পরে হবে। তাড়াতাড়ি কি?

সমস্তই আমার ঠিক করা আছে, পাঠালেই হয়।

২২

31. 10. 13
Rangoon.

প্রমথ, তোমার পত্রের আশায় আশায় থাকিয়া বিলম্ব হইয়া গেল। আজ এই মাত্র তোমার চিঠি পাইয়াছি। যেমন সময়ে পাইলাম, তখন আর registry করিবার সময় ছিল না, এবং unregistered পাঠাইতেও সাহস হইল না বলিয়া আগামী মেলে পাঠাইতে হইবে। এ মেলে হইল না। তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম এই ভাবিয়া যে, এত বড়টা তোমাদের কাযে লাগিবে কি না। এখন দেখিতেছি 'বিন্দুর ছেলে'র ডবল হইয়া গিয়াছে। আমার গল্পের একটা natural সমাপ্তি আছে, plot হিসাবে সেটা সম্পূর্ণ আপনা আপনি হয়, আমি গরজ বুঝিয়া তাহাকে ছোট কিম্বা বড় করিতে পারি না। এখানে আমার গুটিকতক সমজদার সাহিত্যিক বন্ধু আছেন, তাঁদের মতে, আমার অপরাপর গল্পের চেয়ে—art প্রভৃতি হিসাবে, এবং লেখার হিসাবেও far more excellent—তবে আমি নিজে ঠিক সে কথা বলিতে পারিব না, আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে নিজে ঠিক judge নই। তোমরা ভাল বলিলেই এখন সার্থক হয়। একটু মন দিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়ো—তবে, এটা অবশ্য

বলিতে পারি, তোমাদের কাগজে এ পর্য্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার চেয়ে কোনমতেই নিকৃষ্ট হইবে না। এখন তোমাদের রুচি। একে তুমি যেমন ইচ্ছা তেম্‌নি করিয়া প্রকাশ করিতে পার অর্থাৎ যা ভাল বুঝিবে তাই করিয়ো। আমার শুধু এই অনুরোধ যে ছবি দিতে পারিবে না। তাহাতে অনর্থক পয়সার শ্রাদ্ধ অথচ আমার মতে আবশ্যকীয় নয়। অন্ততঃ আমার গল্পে নয়। আশা করি আমার এই অনুরোধটা একবার রাখিবে। তাহাতে আমারও আহ্লাদ হইবে। তোমাদেরও পয়সা বাঁচিবে। এবং গ্রাহকও খুশীই হইবে অন্ততঃ দুঃখিত হইবে না।—শরৎ

আগামী মেলে registered তোমার ঘরের ঠিকানায় পাইবে।

২৩

[নবেম্বর ১৯১৩]

'বিরাজ বৌ'

প্রমথনাথ, আমার গত পত্রে আশা করি সব কথা জানিয়াছ। গল্পটা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, তাহারও সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিয়াছি। একে ত এত বড়, তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তার পর তোমার অভয় পাইয়া পাঠাইলাম! গল্পটা একটু মন দিয়া পড়িয়ো এবং immoral ইত্যাদি ছুতা করিয়া reject করিও না। তাও যদি কর, কাহাকেও reject করার কারণ দর্শাইয়ো না। আমার "চরিত্রহীন" তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী telegraph করিয়াছে

"Charitrahin creating alarming sensation." আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে-কোন কারণেই হৌক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে—(character unquestionable নয়) আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্য্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যেই এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই! কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু, এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন! সোনার হরিণ কত কি কীর্ত্তিই সুরু করিয়া দিয়াছে। (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত! Detective story ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠানদি'-গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর 'গদাই পাল' আর সেই মাগীটা তেমনি এও)। কোন দোষ নাই কেন না নাম 'রত্নদ্বীপ'! (এবং লেখক প্রভাতবাবু) আর আমার 'চরিত্রহীন' যত অপরাধে অপরাধী? যারা ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ কিম্বা জার্ম্মান নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে ইহা সত্যই immoral কি না। কিন্তু তোমরাও ভুল বুঝিয়াছ বলিয়াই আমার যত দুঃখ। তোমাদের 'সুরজ কওর' সম্বন্ধে কেহ কথাটি বলিল না! টলষ্টয়ের Resurrection শ্রেষ্ঠ বই! যাই হৌক আমি এখনও স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে 'চরিত্রহীনে' এক বর্ণও immorality আছে। কুরুচি থাকিতে পারে, কিন্তু যা পাঁচ জনে বলিতেছে তা নাই। তবুও নাম দিয়াছি 'চরিত্রহীন,' এর মধ্যে

"কুল-কুণ্ডলিনী" জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না। 'রত্নদীপ' নাম দিয়া—বাড়ীর কেচ্ছা সুরু করি নাই। যাই হোক, তোমাকে আমি একটু ভয় করি বলিয়াই 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে এইটুকু আবেদন করিলাম। এবং তোমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার ভয় ঘুচিবে না, এ গল্পটা তোমাদের কাছে immoral বলিয়া মনে হইয়াছে কি না। যদি হয়, আর কাহাকেও না দেখাইয়া চুপি চুপি registered ফিরিয়া পাঠাইবে। কাহাকেও জানিতে দিবে না তোমাকে কোন কিছু পাঠাইয়াছিলাম কি না। এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার বাড়ীর অনেকটা ভাল খবর পাইয়া খুব সুখী হইলাম। হাঁ changeএ পাঠাও। আমার যাওয়ার সম্বন্ধে—শরীর বেশ করিয়া না সারিলে এক পা নড়িব না। যেমন আছি, তেমনি থাকিলে X'mas নাগাদ দেখা যাইবে।

মূল্য সুরু করিয়াছি। 'ভগবানের মূল্য' 'বিধবার মূল্য' পূর্ণ তেজে অগ্রসর হইতেছে। ভাল কথা, তোমার সেই কাণাকড়ির মূল্যের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম—আজ তাহাকে হঠাৎ পাইয়াছি। দুই চারি দিনে তাহাকেও ঠিক ঠাক করিব।

আমার 'রামের সুমতি' প্রভৃতির কাপি শীঘ্রই পাঠাইব। একটু ভালো করিয়া ছাপাইলে ভাল হয়—অবশ্য যা বুঝিবে তাই করিবে।

এইবার কাযে মন দিই।—শরৎ

২৪

Rangoon
13. 3. 14

প্রমথ, পরশু সন্ধ্যায় ফিরিয়াছি। রক্ত আমাশা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। বেশ রোগটি, না? তোমার কেমন? শুনিলাম, আমি নাই, এই মর্ম্মে হরিদাস বাবুকে জানাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। বুদ্ধির কাজ করা হইয়াছিল। কিন্তু, তুমি বুদ্ধিমান্ হরিদাস বাবুকে সে সম্বাদটা দাও নি কেন? তা হ'লে তিনি ত আমার চিঠি না পাওয়ার দরুন, লেখা না পাওয়ার দরুন দুঃখ করতেন না! আজ ২০০৲ পেলাম। ভাল। ছোটগুলাও পাঠাচ্ছি। লোভে পড়ছি না, কি, তাও আবার ভাবছি। শুনি সাহিত্যিকের মৃত্যু ইহাতেই ঘটে। হরিদাস বাবুকে বলিয়ো তিনটা ছোট গল্প যেন না ছাপান। এইবারের ছোট গল্পটা (সম্ভব ভালই হবে) এক ক'রে চারটা গল্প চতুষ্পদ নাম দিয়ে ছাপালে বেশ হবে, কি বল? বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা জ্ঞান জন্মেছে। ভায়া, এবারে আর ফাঁদে পা শীগ্‌গীর দিচ্ছি না। এমন ক'রে এবার থেকে আট-ঘাট বেঁধে লিখব যেন, প্রভাতবাবুও দোষ খুঁজে না পান। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে—ঐগুলোর ত আর দোষ বার করা যায় না। 'হরিনাম' যেই করুক, লজ্জার খাতিরেও ভাল বলতে হবে। আমি 'হরিনাম' গাইব। দেখি এতে কি হয়। বৈশাখের জন্য হরিদাস বাবুকে নিশ্চিন্ত হ'তে ব'লো। আমি কথা দিচ্ছি। একটা বড় উপন্যাস 'গৃহ-দাহ' নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি—এতেও ঐ শিক্ষা কাযে লাগাব। ফাঁদে পা দেব না। 'বিরাজ বৌ' নিয়ে যেমন মানুষ ঐটুকু খুঁত পেয়েই

হৈ চৈ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে—ও সুযোগ আর সাধ্যমত দিচ্ছি না।

কেমন আছ? ছেলে মেয়ে কেমন? গৃ—কেমন? জায়া, পিসিমা—সব ভাল ত? সম্ভব 20th April start ক'রব।—তোমার শরৎ

কি খাটুনি বাপ রে! রক্ত আমাশা হয়ে শাপে বর হয়েছে—আর যাচ্ছি না।

২৫

Rangoon
28 3. 14

প্রমথ, নানা কারণে তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরি করিয়াছি। Inject করিতে আমার ভরসা হয় না—ওসব আমি পারিব না। জান বোধ হয় আমি ভয়ানক opium-eater—তাহায় রক্ত আমাশা! ব্যাপার এই। যা হোক এ দেশে ম্যাংগোষ্টিন ফলে এ রোগ খুব সারে আমি তাই খাই—প্রায় সেরে এসেছে। ভয় নেই। না হ'লে, এ মুল্লুকের রক্ত আমাশায় লোক ২৪ ঘণ্টায় পর্য্যন্ত মরে। তবে ভাবনা এই ছিল যে আমার অত সুকৃতি নাই। আমার এই, তার পর এদিকের হঠাৎ neuralgic pain পিঠের নীচে হইয়াছে গত বৃহস্পতিবার থেকে আজ শনি—২০।২৫ টাকা বোধ করি ঔষধ শুধু লাগ্‌ল—কিছুতেই সারছে না। রাঁধাবাড়া, অফিসের কাজ করা, ডাক্তার ঔষধ মালিশ করা—সমস্তই দরকার—গোদের ওপর বিষফোড়া, চাকর পালিয়েছে। মন কি রকম বোঝা বোধ করি শক্ত নয়। তার ওপর ফণির যমুনায়—

থাক সে কথা। একটা গল্পের অর্দ্ধেক লিখে আজ পাঠাব মনে করেছিলাম কিন্তু রেজিষ্ট্রির সময় নেই—সেইটা তোমার ঠিকানায় আগামী মেলে পাঠাব যদি সময় থাকে, আর আমার ওপর ভরসা করতে পার তা হ'লে অর্দ্ধেকটা ছাপিয়ো—১০।১২ দিন পরে শেষটা শেষ ক'রে দেব। খানিকটা পড়লেই বুঝতে পারবে। তবে ছাপাবার তখন সময় থাকবে কি না জানি না। এবারের 'ভারতবর্ষ' পেয়েছি। প্রবন্ধগুলি সবই প্রায় ভাল। হরিদাস বাবুকে চিঠি লিখতে লজ্জা বোধ হচ্ছে।—শরৎ

২৬

54, 36th Street, Rangoon.

[ডাকমোহর ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫]

প্রমথ, তোমার পত্র পাইয়া জানিলাম তাহারা সবাই ভাল আছে। তোমার আবার জ্বর হইতেছে শুনিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। ব্যাপার কি, ম্যালেরিয়া না কি? বোধ হয় তাই। তা' যদি হয় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। খাট দুটা ভাল হয় নাই তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম—নেহাৎ জাবাড়ে-গোছের হইয়াছে—মিস্ত্রীর অসুখ না হইলে আর একটু চলনসই হইলেও পারিত। যা হোক কতক কাজে লাগাইতে পারিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মাপ দিতে ভুল করিয়াছিলে তাই আবার বেঞ্চি করিয়া গচ্ছা লাগিল—সেটা নেহাৎ তোমারই দোষ।

খাটের দাম ২৩৲+১৲ পেতলের স্ক্রু। আর বাঁধবার দড়ি, কিছু কুলীর খরচ। সেটা **contingent expense.**

এই ২৪৲ টাকার বাকী ২০৲ টাকা দেবার জন্য তোমার যেন আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। প্রতি পত্রেই সেই কথা। এটা জানিয়া রাখ বিশ টাকা না পাইলেও আমার দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিবে না, পাইলেও বিশেষ দুঃখ দূর হইবে না। আমার অভাব উহাতে বাড়েও না কমেও না। দিলে ভাল হয় দাও, না দিলে ভাল হয় দিও না। আমি আর বকাবকি করিতে পারি না। কি একটা তুচ্ছ কথা কত বার উল্লেখ করিবে? তুমি ত আমাকে ঢের জিনিস দিয়াছ আমি ত অম্লান মুখে লইয়াছি—কখনও টাকা দিবার জন্য মনের মধ্যে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। যেমন করিয়া দিলে তোমার ভাল বোধ হয় তাই দিয়ো। চোরবাগানেই দিও। যাক্।

এঁকে ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবা মাত্র একখানা টিকিট রিজার্ভ করিবার জন্য B. I. S. N.কে intimation দিয়ো। তাহারাই বলিয়া দিবে কোন্ জাহাজে berth পাওয়া যাইবে। তার পর যেদিন হোক্ টাকা লইয়া টিকিট লইয়া আসিয়ো। তার 45-0-0+ভেলুর 4/-=49/-.

তোমার শরীর অসুস্থ তোমাকে কোন উপরোধ করিতেই লজ্জা করিতেছে। কিন্তু আমার একটি বন্ধুর ৪।৫ মার্চ্চ নাগাদ ফিরিবার কথা আছে। খুব সম্ভব তিনি ছেলেমেয়ে পরিবার লইয়া আসিবার পথে চোরবাগানের সন্ধান লইয়া আসিবেন—সে হইলে অনেক

আসান, না হইলে হয়ত তোমাকেই বড় কষ্ট পাইতে হইবে। জিনিসপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতে হইবে। যে সব জিনিসের আবশ্যক নাই (কারণ আমি ১ বৎসরের মধ্যেই আবার ফিরিয়া যাইব) তাহা তোমার ওখানে থাকিলেই সুবিধা। তবে বইগুলো কোনমতে প্যাক করিয়া নষ্ট না হয় এরূপে আনা চাই। বঙের বাক্স আরও একটা ছোট বইয়ের বাক্স আনিবার আবশ্যক নাই। বড সিন্দুকটাও দরকার নাই।

কি কি আনা চাই তা' সেই ভাল জানে।

আর একটা কথা। ৪।৫ জোড়া গায়ে গাঁথা বঁড়শি—বড সাইজের ২।৩ জোড়া, মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কড়া ও হাতে-ভাঙ্গা মুগার সুতা—ভাই, নিশ্চয় দিয়ো। ওঁর কাছে টাকা চাহিয়া লইয়ো। আর সেই ঘড়িটা যদি চলে তবে, না হ'লে নয়। অচল ঘড়ি আমার বইয়ের আলমারিতেও একটা আছে। মাঝে মাঝে চলে, মাঝে মাঝে থামে তাতে আবশ্যক নাই।

যাহোক first available টিকিট রিসার্ভ করিবার চেষ্টা করিবে।

আর এ বিষয়ে কিছু লিখিতে চাই না—তুমি আমার চেয়ে কম বোঝো না।

হরিদাস ভায়াকে বলিবে আমি একটা গল্প লিখিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। এইবার শেষ করিয়া পাঠাইব। এ মাসে যাবে না বোধ করি, কারণ সময় নেই।

এরা না এলে লিখতেই পারি না। মেসে হয় না—সব লোকেই দেখতে চায় উঁকি মারে—এই সব উৎপাত। আমি যে অবস্থায়

অনেক লিখেছিলাম—ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে আর কিছু হয়ে উঠছে না—দেখছি!

হরি ভায়ার পিতাঠাকুর মশায় আছেন কেমন? বোধ করি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। আমার প্রায়ই তোমার সেই কথাটা মনে পড়ে, সেই যে বলিয়াছিলে হরিদাসের টাকা চুরি প্রভৃতি দেখিয়া ভয় হয় পাছে বৃদ্ধের কোন বিঘ্ন হয়। বাস্তবিক তাই। সত্যই তাঁর দুঃসময় পড়েছিল। কিন্তু এ বৎসর আর ভয় নেই। হরিদাসের কথা আমি প্রায়ই মনে করি। সত্যই a good man যথার্থ এই উপাধিটা আজকাল কেন সব কালেই পাওয়া শক্ত। আমার মনের বিশ্বাস He deserves respect & affection—না? তোমার কথাই সত্য। থাক্ পরচর্চ্চায় কাজ নাই। Sarkar & Sonsদের সম্বন্ধে তোমাকে পরে লিখব। আগে নিজে একটা জবাব দিই।—শরৎ।

ভাল কথা, আজকাল 'ভারতবর্ষ' আগের চেয়ে ঢের ভাল হচ্ছে, না? আমার মতও এই, আজকাল অনেক বন্ধুবান্ধবেরও মত দেখছি এই। যারা মোটেই সুখ্যাতি করত না বরং নিন্দা করত তারাও এখন বলে—'মন্দ না'—আমাদের দেশের তুলনায় এই এর চেয়ে আর ভাল হয় না। বুঝেছ? এইবার আর 'ভারতবর্ষে'র মার নাই—টিকিয়া গেল।

[ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত]

[১৯১৩ সনের শেষ ভাগে লিখিত]

পরম কল্যাণীয়,……মাঝে মাঝে মনে করিতেছি কিছু ছুটি লইয়া বর্ষাতেই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকি, আর কলিকাতায় ফিরিব

না। যা হয় পরে লিখিব। আপাততঃ ভাল আছি, কিন্তু লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে পবিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তোমরা আমাকে কলিকাতায় গিয়া থাকিতে বলিতেছ সত্য, কিন্তু আমার ওটা পছন্দ হয় না। চাকুরি বাকুবি ছাড়িয়া দিয়া ভবঘুরে হইয়া বেড়াইতে এই অসুস্থ শরীরে মোটেই পছন্দ করি না। আর, কাহারো কাছে গিয়া থাকা—সে ত একেবারেই অসম্ভব। আমি ববং হাসপাতালে মরিব, কিন্তু কিছুতেই কাহারো ঘবে এই পীড়িত দেহ লইয়া গিয়া শেষ রাখা রাখিব না। ওটা আমি ঘৃণা করি। আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু আছে তাহা জানি, গেলে কিছু দিন যত্ন যে না হয় তা মনে করি না, কিন্তু আমি আব কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা কবি না। যদি যাই, আমার বড় ভগিনীর ওখানে গিয়াই থাকিব, কেন না সেইটাই এক রকম আমার বাড়ীঘব দোর। তাঁর অবস্থাও খুব ভালো—ক্রমাগত যাইবার জন্যও পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু অসুস্থ শবীরে আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমার কেবলি ভয় পাছে হঠাৎ মরিয়া গিয়া তাঁদেব বিব্রত করি। তবে আর বোধ হয় কোন আশঙ্কার হেতু নাই। বর্ষাকালটাই আমাব বড় শক্ত কাল, বর্ষা ত শেষ হইল, এইবাব ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিব বলিয়া ভবসা করিতেছি। আমার অসময়ে এই 'চরিত্রহীন' যদি শেষ না করিতেই পারি আব কে করিতে পারিবে তাহা গত বাবে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলাম, তাহাব একটা জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

আর একটা কথা জানিতে ইচ্ছা কবি। "নাবীর মূল্য" শেষ হইয়া গেল, ইহার যে এত বড় সুখ্যাতি হইবে তাহা মনেও করি নাই, কিন্তু এখন পরিচিত অপরিচিত লোকের নিকট হইতে ইহাব বহু আলোচনা

ও চিঠিপত্র পাইয়া মনে হইতেছে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে যেমন প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বোধ করি ঠিক তাহাই হইতে পারিত।···

তবে, এও একটা কথা, যাহারাই কেন প্রতিবাদ করুন না, নিতান্ত স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া অবহেলা না করেন যেন। ভাল কথা, এটা যে আমার লেখা তাহা মণিলাল জানিল কিরূপে? মানসী, প্রবাসী, সাহিত্য, এঁরাই বা জানিলেন কেমন করিয়া? তুমি ত প্রচার করিয়া দাও নাই? অবশ্য, যাহারা আমার লেখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাহারা বুঝিতে পারিবে, কিন্তু সাধারণের ত বুঝিবার কথা নয়।··
('যুগান্তর,' ৩ মাঘ ১৩৪৪)

*　　　*　　　*

[?]

54, 36th Street, Rangoon,
1-2-16

সবিনয় নিবেদন,

পরিচয়ের সৌভাগ্য না থাকা সত্ত্বেও মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা লাভ করিয়া আমি নিজেকে বারম্বার ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আপনি নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও ত প্রায় তাহাই। আমারও বয়স (৩৯) উনচল্লিশ হইয়াছে। তথাপি যদি বয়সে কিছু ছোট হই ত আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

পত্রে আপনি নিজের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া

আসিয়াছেন বলিয়াই আপনার জন্মভূমির প্রতি মমতা ত যায়ই নাই বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিম্বা এ কথাও হয়ত ঠিক নয় কারণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরেই যে জন্মভূমি পল্লী-জননীর প্রতি স্নেহ জন্মে তাহাও নয়। আমি কলিকাতা-প্রবাসী অনেক বড় লোকের জন্মস্থানগুলি চোখে দেখিয়া আসিয়াছি—কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নাই। তাঁহাদের যাহা সাধ্য তাহার শতাংশের একাংশও যদি সেদিকে দান করেন, বোধ করি দুঃখী গ্রামগুলির সৌভাগ্যের আর অন্ত থাকে না।

আমার নিজের ত সময় এবং সাধ্য দুইই এত সামান্য যে তাহা সম্পূর্ণরূপে গণনার বাহিরে ফেলিয়া দিলেও কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না তথাপি আমি শুধু এই চেষ্টাই করি যদি একটা লোকেরও তাহার পল্লীর উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই জন্যই অত্যন্ত অপ্রিয় এবং ক্লেশকর হইলেও পল্লী সম্বন্ধে সত্য কথাগুলিই বলিবার চেষ্টা করি। সহরের লোকেরা কল্পনা করিয়া পল্লীগ্রামের যে সকল সুখ্যাতি প্রচার করেন অনেক সময়েই যে তাহা যথার্থ নয়, বরঞ্চ পল্লীগ্রাম ক্রমশঃ অধঃপথেই যাইতেছে এই সত্য কথাটা এই পল্লী-সমাজ বইটাতে বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করায় এবং সফলতায় যাহা প্রভেদ আমার লেখাতেও বোধ করি ততটুকু মাত্রই হইয়াছে।

আপনি এটাকে নাটক আকারে প্রকাশ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। হয়ত, করিলে ভালই হয় কিন্তু আমার নিজের ত সে ক্ষমতা নাই। অন্ততঃ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া ত কখনো দেখি নাই। যদি আর কেহ কষ্ট করিয়া করেন (যাঁহার ক্ষমতা আছে)

বোধ করি ভাল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ত শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। এবং কোন থিয়েটারই তাহাদের সময় এবং সামর্থ্যের অপব্যয় করিয়া তাহাকে stage করিতে চাহিবে না। তবে, আপনার উপদেশটিও মনে রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি কিছু করিতে পারি চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে, গ্রাম সম্পর্কীয় আমার 'পণ্ডিত মশাই' বইটাকেও কেহ কেহ 'নাটক' করিবার কথা তুলিয়াছিলেন কিন্তু হয় নাই। সেটা বোধ করি আরও ভাল হইলেও হইতে পারিত।

যাই হোক আপনার এই উপদেশটিকে আমি বিস্মৃত হইব না এবং সেজন্য আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

নিঃ শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

*　　　*　　　*

[শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত]

54, 36th Street, Rangoon

7. 4. 16

পরম কল্যাণবরেষু—

বহু দিন পরে আপনার পত্রের জবাব দিতে বসিয়াছি। বিলম্ব এত বেশি হইয়াছে যে আপনি নিশ্চয়ই এ আশা অনেক দিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমি অত্যন্ত কুড়ে মানুষ। আমার পক্ষে এ রকম অপরাধ প্রায় স্বাভাবিক। তবে, এ ক্ষেত্রে একটা কৈফিয়ৎ এই আছে যে বড় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহা এতই বেশী যে এখানে থাকা আর

চলিল না—বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইতেছে। এ পত্র যখন আপনার হাতে পড়িবে তখন আমি আর এ ঠিকানায় থাকিব না। যদি দয়া করিয়া কখনো এ পত্রের জবাব দেন, তবে, যেমন করিয়া আমার বর্ত্তমান ঠিকানা অবগত হইয়াছিলেন তেম্‌নি করিয়াই জানিতে পারিবেন। যদিচ, বুঝিতেছি সে আবশ্যক আর হয়ত আপনার হইবে না।

কিন্তু সে কথা থাক্। আমার লেখা পড়িয়া আপনার ভাল লাগিয়াছে। এই আমার পরিশ্রমের পুরস্কার। আপনি যে এই কথা জানাইয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন সেজন্য আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি—আশীর্ব্বাদ করিতেছি আপনিও এম্‌নি সুখী হোন।

ভগবানের কাছে আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

আশীর্ব্বাদ শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

[হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

শিবপুর, ২৯-৬-১৬

ভায়া, -আমাকে ব্যথাটা কুঁজো ক'রে ফেলেছে। কাল খুবই ভিজে বাড়ল বোধ করি। আসলে ব্যামোই আমার এই বুকটা।

জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবারে। তাতে আমারই মস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এত দিন কথাটা আপনাকে বলি নি যে দেশে আমি 'একঘরে'— আমার কাজকর্ম্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক্ সে জন্যেও ভাবি

নে কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ, আমি না যাই এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চার-শ টাকাব অকুলান। এটা আমাব চাই।… আপনাব শবৎ

১লা নভেম্বর। '১৮।

বাজেশিবপুর।

পরম কল্যাণবরেষু,—আজকাল ভাল আছি বটে, কিন্তু, কলকাতায় যেতে ডাক্তার বারণ করেন। অনেক দিন থেকেই দেহটা বোধ করি নিস্তেজ হয়ে আস্‌ছিল, তাই ডেঙ্গু, war-fever, ইনফ্লুয়েঞ্জা কোনটাকেই এ বছর বাদ দিতে পারলাম না।

মনে করচি, কিছু দিন ভাগলপুর থেকে ঘুবে আসি। বাড়ীর ডাক্তার আছে, বিশেষ ভয় নেই।

আসল কথা কিন্তু 'ভারতবর্ষ' নিয়ে। 'দাদা'র সঙ্গে কতকটা কথাবার্ত্তা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন মীমাংসা হ'ল না। একে ত এবার দারজিলিঙ্ থেকে আসার পরে তাঁর কাণের এতটা উন্নতি হয়েছে যে, বলশালী লোকেও দু'চারটে কথার পরে হাঁপিয়ে ওঠে। আমি ত আজকাল জোরে কথা কইতেও পাবি নে, পাবাও বাবণ।

আপনার সঙ্গে একবার দেখা হ'তে পারলে ভালই হ'ত, কিন্তু, আমার ত নড়বার চড়বার জো নেই। আপনিও যে কাজকর্ম্ম ছেড়ে আস্‌তে পারেন সেও সম্ভব মনে করি নে। তবে রবিবার দিন দুপুর বেলা গাড়ী ক'রে যদি এদিকে একটু বেড়াতে বার হন ত হ'তেও পারে।

ভাব্‌ছিলাম, কিছু কাল যদি লেখা-পড়া বন্ধ করি ত সত্যিকারের কোনপ্রকার অপযশ আমাদের কাগজে পৌছয় কি না।

আবার এমনও হ'তে পারে হয়ত দু-পাঁচ দিন ভাগলপুরে বাস করার পরেই লেখার energyটা ফিরে পেতে পারি। সে হ'লে ত খুবই ভাল হয়।

আমার নাটকের কত দূর হ'ল? বোধ করি শেষ হয়ে গেছে, না? একটা উত্তর দেবেন।—আপনাদের শরৎ দা'।

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা
৫ই আষাঢ, ১৩৪৪।

ভায়া,—জ্যাঠামশায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করার জন্যে কন্যা এনেছেন দণ্ড বহু দূর মুসোরি থেকে। শ্রীচরণে অর্পণ করার ইঙ্গিত বোধ করি এই যে ভবিষ্যতে না লিখলে কাজকর্ম্ম না করলে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে।

যাই হোক, লাঠিটি চমৎকার। আমার কাজে লাগবে। ঠ্যাং দুটোকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে।—শরৎদা

* * *

[মহেন্দ্রনাথ করণকে লিখিত]

বাজেশিবপুর।
শিবপুর, ১০-১-১৮

সবিনয় নিবেদন,—আপনার পত্র পড়িয়া সুখ-দুঃখ দুইই পাইয়াছি। আমার লেখায় আপনারা যে ব্যথা পাইয়া তাহা নীরবে সহ্য করেন

নাই, ইহা আমাকে কম আনন্দ দেয় নাই। এ সম্বন্ধে আমি আজ পর্য্যন্ত ১২।১৪ খানি পত্র পাইয়াছি। প্রত্যেককে আলাদা করিয়া জবাব দেওয়া সম্ভবপর নয় মনে করিয়া ছাপার লেখার ভিতর দিয়াই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে বসিলাম। কারণ, সকলের বেদনাই এক ওজনের নয়, এবং, সকলেই দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহার অবসানের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

আমি "দেশে" পোদ জাতির অস্পৃশ্যতার কথা যখন লিখি, তখন "দেশ" বলিতে আমার নিজের গ্রামটাই মনে ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে একটি পোদ বালক পানের ব্যবসা করিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ছেলেটি আমার দিদিকে মা বলিত। তাহার এক সময়ে হঠাৎ একটা সাংঘাতিক পীড়া হয়। দিদি তাহার বমি প্রভৃতি পরিষ্কার করায়, তাহাকে ছোঁয়াছুঁয়ি করায় পাড়ার লোকে অনেক কথা বলে। দিদি তাহাতে এই জবাব দেন যে, আমাদের গৃহদেবতা 'দামোদর' যদি তাঁহার হাতে 'ভোগ' না খান ত তিনি স্বপ্ন দিবেন। কারণ এই বিশ্বাস বাড়ীতে সকলের ছিল যে কিছু একটা অনাচার হইলেই 'দামোদর' স্বপ্ন দেন। অবশ্য এবার তিনি কোন প্রকার আপত্তি করিয়া স্বপ্ন দেন নাই। সেই পীড়ার সময় আমার স্পষ্ট স্মরণ হয় দিদিকে দিনে ৫।৬ বার করিয়া স্নান করিতে হইত।

তবে, এখন সম্বাদ লইয়া জানিতেছি যে সকল জেলায় এক প্রকার প্রথা প্রচলিত নাই। যেমন আজও কোন কোন জায়গায় ··· ছুঁইলে কাপড় ছাড়িতে হয়, কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে হয় না।

এইবার আমার নিজের কথা বলিব। আমাব লেখার যথার্থ তাৎপর্য্য আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোন জাতিকে আমি অস্পৃশ্য মনে করি না এবং কাহারও হাতে জল খাইতে আমার বাধে না। বরঞ্চ, লোকেব যখন বাধে তখন সেইটাই আমাকে সবচেয়ে বাধে।

বই ছাপাইবার সময় এই ছত্রটা* ত আমি তুলিয়া দিব বটেই, আব ইহা জাতি-বিশেষের একটা মনঃপীডার কারণ হইবে বুঝিলে আমি লিখিতাম না। কিন্তু, আমার সকল লেখার সহিত আপনাব পরিচয় থাকিলে এ সন্দেহ আপনার হইত না যে, উঁচু জাত্‌কে সত্য সত্যই 'উঁচু' জাত মনে করিয়া তাহাদিগকে 'বড়' করিয়া তুলিবাব অভিপ্রায়ে বা 'নীচু' জাতিকে মনোবেদনা দিয়া humour সৃষ্টি কবিবার জন্য এ কথা লিখি নাই। বরঞ্চ উল্‌টা।...

বাজে শিবপুর,
৫ঠা আশ্বিন '২৬

সবিনয় নিবেদন,—আপনার পত্রখানি আমি দুইবার করিয়া পড়িয়াছি। আমার সেই পত্রখানির অংশবিশেষ যদি আপনার কোন কাজে আসে ত আমি খুশীই হইব। যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন আমার লেশমাত্র আপত্তি নাই। তবে আমার চিঠি লেখার প্রণালী এত কাঁচা, এত এলোমেলো যে ভাষার দিক দিয়া একটু

* ১৩২৪ সালের পৌষ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী"র পৃ. ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

লজ্জা করে। (!) মহেন্দ্র বাবু, আমি কেবল দুইটি জাতি মানি আমার আন্তরিক বিশ্বাস কোন মানুষেরই কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের,—মস্তিষ্কের। সে কেমন জানেন ? এই ধরুন আপনি নিজে। আপনার শিক্ষা, আপনার হৃদয়ের প্রশস্তত' ইহার স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির দুঃখে বেদনা বোধ, ইহার উদ্যম, ইহার আন্তরিকতা,—এইগুলিই বড় জাতীয়। যে আধারে ইহারা বাস করে সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে-বাগ্দীই বা কি—ওইগুলা না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলাই কোন মানুষকে কোনদিন উচ্চ পদ দিতে পারিবে না। সে লেখা সোনার জল দিয়া মহামহোপাধ্যায়ের কলম হইতে বাহির হইলেও না।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বেশ নাম। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ও কথাটাও ব্যবহার করিতে করিতে ক্রমশঃ একটা বাদ দিলেই চলিয়া যাইবে।

আপনি ঘৃণা দিয়া ঘৃণার প্রতিশোধ দিবার কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় আপনার কথাই সত্য। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই, সেই জন্য মতামত দিতে পারিলাম না। তবে, এটুকু বুঝিতে পারি কেবলমাত্র ভাল মানুষের দ্বারাই সংসারে সকল কাজ চলে না। ('পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার', আশ্বিন ১৩৩১)

* * *

[শ্রীঅমল হোমকে লিখিত]

বাজে শিবপুর—হাওড়া

১৬-৮-১৯

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও না কি খুব ফাঁড়া গিয়েছে।[১] ইংরেজের মারমূর্ত্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল ক'রে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হ'তে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন--এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন ক'রে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

'নারায়ণে'র সময় সি আর দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন না কি দাশ-সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।[২]

---

১ চিঠিখানি ১৯১৯ সনের পঞ্জাব-হাঙ্গামা ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময় লিখিত; শ্রীযুত হোম তখন লাহোরের দৈনিক 'ট্রিবিউন' পত্রের সহিত যুক্ত।

২ ১৯১৫ সনের জুন মাসে তৎকালীন ভারত-সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯-এর ৩০শে মে তিনি পঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে সেই উপাধি বর্জন করেন।

তোমার কাগজের নামই শুনেছি—কখনো চোখে দেখি নি। পাঠিও না দু-একখানা। তোমার এডিটর[৩] ত এখন জেলে। চালাও জোরসে! তোমার নাম-ডাক এখান থেকে শুনেই আমরা খুশী হই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর—হাবড়া
১২ই ভাদ্র, ১৩৩০ [আগস্ট ১৯২৩]

অমল,

আমাকে বিসর্জ্জনটা[৪] দেখাও। শুনলাম আবার না কি হবে। সেদিন সুধীরের দোকানে[৫] গিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাটা[৬] পড়ে যেতে

৩ সুপ্রসিদ্ধ কালীনাথ রায় (মৃত্যু ১৯৪৫)।

৪ ১৯২৩-এর আগস্ট মাসের শেষে কলিকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারের (এখন রক্সী সিনেমা) রঙ্গমঞ্চে বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক পর পর তিন দিন অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করেন জয়সিংহের ভূমিকা।

৫ এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, 'মৌচাক'-সম্পাদক।

৬ এই অভিনয় দেখিয়া নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু (থিয়েটার-মহলে 'ভুনি বোস' নামে পরিচিত) কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজে' এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্র আমন্ত্রণেই অমৃতলাল এই রচনা লেখেন।

না পারার দুঃখটা আরও যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাটা সত্যিকার বল তো কার? অমন ইংরেজী কি ও বুড়ো লিখতে পারে? এ যে রীতিমত মুন্সিয়ানা!

যাকগে ইংরেজী। আমি ওর কি-ই বা বুঝি? অভিনয়টা কিন্তু সত্যিই বুঝি। সখের থিয়েটার অনেক করেছি। ফীমেল পার্টও বাদ যায় নি। রবিবাবুর অভিনয় দেখি নি কখনো। সুরেশ সমাজপতির কাছে তার গল্প শুনেছিলাম একবার। লোকটাকে হয়ত তোমরা রবিবাবুর নিন্দুক বলেই জান। একবার যদি তাঁর মুখে সঙ্গীত-সমাজে রবিবাবুর বিসর্জ্জন অভিনয়ের গল্পটা শুনতে। অতএব ও বস্তু না দেখে মরছি না। তুমি এই চিঠি পেয়েই খবর নেবে আবার কবে হচ্ছে, আর দুখানা দশ টাকার টিকিট কিনবে। তারপর আমাকে জানাবে ও যথাসময়ে এম্পায়ারের সাম্‌নে হাজির থাকবে। কিন্তু তোমারও কি টিকিট লাগবে অমল, রবিবাবুর অভিনয়ে? তা লাগে লাগুক।

তোমাদের

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া ২৪-২-২৭

অমল,

তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি, অথবা এই মনে ক'রে দিই নি যে, দেখা হ'লে সমস্ত কথা জানাবো। তোমার "অতি-আধুনিক

বাংলা কথা-সাহিত্য"[৭] আমি সেই দিনই আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলাম। তোমার বক্তব্য বিষয়ের মূল বস্তুটি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। দু-একটা কথা হয়ত না বল্‌লেই হ'ত; তবে কেউ না বললেই বা বলা হয় কিরূপে? একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে। আর একটু ছোট হ'লে একটা সুবিধে এই হ'ত যে, কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধেই একবারের বেশী বার বলবার স্থান থাকত না। তীক্ষ্ণতা একটু কম হ'ত।

কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে এর মধ্যে টেনে না আনলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশী হ'তাম। যদি বল, 'আপনাকে আনলাম কি ক'রে?' তার উত্তরে আমি বিষ্ণু শর্ম্মার কৃষক ও শৃগালের গল্প উল্লেখ করতে পারি। শৃগাল বলেছিল—'ভাই, তুমি মুখে যেমন চুপ করেছিলে, তেমনি আঙুলটিও যদি না আমার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে রাখতে! ভাগ্যি, শিকারীরা তোমার আঙুলের দিকে নজর করে নি।'

তাই না অমল? "গোর্কি, শেখব, শরৎ চন্দ্র কি,—" তার পরে আর সমস্ত প্রবন্ধের ভেতর শরৎ চন্দ্রের নামগন্ধ নেই! রবিবাবুর নানাবিধ উদাহরণ তোলার পরে যদি অন্ততঃ, আমার ওই রকম দু-একটা গল্প, যেমন "রামের সুমতি," "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি,—অর্থাৎ দুর্নীতি বা অশ্লীলতা দোষ যাতে নেই,—ইঙ্গিতেও তুমি তা উল্লেখ করতে ত এটা বোঝা যেত, তুমি ঠিক এঁদের মধ্যে আমাকে ঠাঁই দিতে চাও নি।

তোমার মুখ থেকে যদি না আমি নিজে আমার সাহিত্যের সম্বন্ধে তোমার মতামত বহু বার শুনে আসতাম, তবে অনেকের মতো আমারও মনে হ'ত, তুমি ইঙ্গিতে এঁদের সকলের আগে আমাকেই

৭ ১৩৩৩ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' দ্রষ্টব্য।

দাঁড় করিয়েছ। অথচ, তুমি তা করো নি এবং করবার সঙ্কল্পও ছিল না তোমার।

যাই হোক, তোমার রচনা প্রভৃতি অতি চমৎকার হয়েছে। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

তোমাদের
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩০-১২-২৭

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার বিয়েতে থাকতে পেরে ভারী খুশী হয়ে এসেছি। তুমি জান খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমাব একটু বাছবিচার আছে, কিন্তু সেদিনের ঐ বিরাট পংক্তিভোজনেও ভারি তৃপ্তি ক'রে খেয়েছি। নির্ম্মল আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। আর এক পাশে ছিলেন তোমাদের জে সি মুখার্জি। ভারী অমায়িক লোকটি।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তোমার ও নববধূর শুভ কামনা করি। আমার সামান্য স্নেহোপহার বৌমার হাতেই দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভীড় ঠেলে তোমাদের কাছে ভিড়তেই পারলাম না। তাঁকে বোলো।

আশীর্ব্বাদ
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ—অনেক দিন পরে সেদিন বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ

যেন তত ফেটে পড়েছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।
শ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
৮ই অগ্রাণ, '৩৮ [নবেম্বর, ১৯৩১]

ভাই অমল,

এই সঙ্গে লেখাটা[৮] পাঠালাম। দেখতেই পাবে কারুকার্য্যের ছটায় অভিভূত করবার চেষ্টামাত্র করি নি। কারণ সেটা অসম্ভব।

তবে, তোমার নিজের দায়িত্বে কিছু ক'রে কাজ নেই। যাঁরা কমিটিতে আছেন, তাঁদের সকলের মত নাও। বড় অসুস্থ, তাই যেতে পারলাম না।

একটা কথা তোমাকে বার বার জানিয়েছিলাম যে, আমি এ-কাজের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই শুনলে না!

তোমার
শরৎ-দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
২৮শে পৌষ, ১৩৩৮ [জানুয়ারি, ১৯৩২]

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ফিরে এসে অবধি ভাবছি তোমাকে লিখব কিন্তু শরীরে দেয় নি। আমি চিরকাল ঘুমকাতুরে মানুষ, কিন্তু কি যে হয়েছে

৮ .৩৩৮ সালের পোষ (ডিসেম্বর, ১৯৩১) মাসে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে রচিত মানপত্র।

জানি নে,—আমার ঘুম যেন কোথায় পালিয়েছে। শরীরে এমন অস্বস্তি কখনো বোধ করি নি। পায়ের একটা পুরোনো ব্যথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে*, আমার গলায় মালা দিলে ব'লে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে ব'লেও নয়—যে ভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায় শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক ক'রে তুললে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু ব'লে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তার কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে কি না-মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি। মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভ'রে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

---

* রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার জন্য যে সম্মেলন হয়, সে সভার অধিনায়ক ছিলেন শরৎ চন্দ্র।

শুনেছি তুমি এই জয়ন্তী ক'রে কলকাতায় বাড়ী তুলছ, গাড়ী হাঁকাচ্ছ! তোমার আমার বন্ধুরাই এ কথা পরম উৎসাহে প্রচার করছেন। জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি—পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে সব করাচ্ছেন! এ যে বাংলাদেশ অমল। 'সোণার বাংলা।' তবু বলতে হবে—'আমি তোমায় ভালবাসি!'

মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না—যে যা বলে বলুক। আমি জানি তোমার বাড়ী হয় নি, গাড়ীও হয় নি—যে গাড়ী চড়ে বেড়াও সে বুঝি কর্পোরেশনের। বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। তা না হোক্—তোমার ভাল হবে। দেশের মুখ রেখেছ তুমি। তোমাকে সমস্ত অন্তর থেকে আবার আশীর্ব্বাদ জানাই।

তোমার

শরৎদা

সামতাবেড, পানিত্রাস পোষ্ট, হাবড়া

১০ই মাঘ, '৩৮ [জানুয়ারি, ১৯৩২]

অমল,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হলাম। রাতদিন একটা কেদারায় কাৎ হয়ে পড়ে আছি আমার সেই বারান্দায়, আর ঢেউ গুনছি। তুমি এলে জমবে ভাল। মুখোমুখি ব'সে অনেক দিন গল্প করি নি তোমার সঙ্গে। দেখ, আড্ডা জিনিসটা উঠে যেতে বসেছে—দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এ যে কত বড় অবনতি, তা যদি কেউ জানত! মনে পড়ে দ্বিজেন মৈত্রের সেই হাসপাতালের ছাদে গঙ্গার আলো

হাওয়ায় তোমাদের সেই আড্ডা—আর শিবপুরে তাঁর ভাই সুরেন মৈত্রের ওখানে, সেও ঐ গঙ্গার ধারে। মনে পড়ে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সেই ন্যাড়া ছাদে আমাদের যমুনা আপিসের আড্ডা। ফণীর ওখানেই প্রথম দেখি তোমাকে। তুমি আর প্রভাত। কি তাকিকই না ছিলে তোমরা দুটি বন্ধু। আর কি পাকা! কতই বা তখন বয়স তোমাদের। সমানে তাল ঠুকে গিয়েছ আমাদের সঙ্গে। তারপর তোমাদের সেই ভারতীর আড্ডা। তেমনটি আর হবে না। আচ্ছা, শান্তিনিকেতনে কবির আড্ডাটা কেমনতরো হয় বলো দিকি। কিন্তু সে আড্ডায় হয়তো তিনিই শুধু কইবেন কথা—অন্যে রবে নিরুত্তর। মনোপলীতে আড্ডা জমে না—শুধু সলিলোকীতে যেমন জমে না নাটক। ইতি—

আঃ শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনঃ—পার তো নীহারকে সঙ্গে এনো। তোমার ভাইটিকে আমার ভারী পছন্দ। শ।

বেহালা, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তুমি মনিকে[১০] ফোন ক'রে ছবি তোলবার সময়টা ঠিক ক'রে নিও। ourne Sheperdএর টাকাটা মনিই দেবে, তোমাদের কাগজের লাগবে না।

সকালের দিকেই আমার সুবিধে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে গড়গড়ার পর একটু গড়াগড়ি না দিলে বুড়ো মানুষ বাঁচব কি ক'রে? আমার জয়ন্তী করতে ব'সে নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে মারবার সঙ্কল্প

১০ বেহালার সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

কর নি! রবিবাবু যে মারা পড়েন নি, সে নেহাৎ তাঁর পুণ্যে। বাপ্ রে বুড়োকে নিয়ে তোমরা কি টানা হ্যাঁচড়াটাই না করেছিলে। পারেনও বটে উনি। কিন্তু আমি রবিঠাকুর নই, আমি—

শরৎ চাটুজ্যে।

হাবড়া, ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯[১১]

অমল, উদ্‌যোগপর্ব্বে উৎসাহ ক'রে তুমি যে সভাপর্ব্বের পূর্ব্বেই ব্যাধিশরশয্যা গ্রহণ করলে, এতে আর যেই দুঃখ করুক, তোমার দুঃখের কিছু নেই। তুমি যে সেদিন টাউন হলে থাকতে পার নি, তাতে তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। সেদিন যারা ভণ্ডুল করেছিল রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও তারাই ছিল। তারা সাহিত্যিক। তাদের আমি চিনি—তুমিও চেন। তারা সে-বার পারে নি—এবার পেরেছে। আশ্চর্য্য হই নি। রবিবাবুর অমল হোম ছিল, আমার নেই কিম্বা থেকেও ছিল না।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনঃ—কেমন থাক জানিও। আসবো একদিন।

* * *

[লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

৭ ভাদ্র ১৩২৬

[২৪ আগস্ট ১৯১৯]

…আমার একটু পরিচয় চাই নাকি? কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই……শ্রীকান্তটা আর একবার পড়ে দেখো। হয়ত

১১ ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে টাউন হলের সম্বর্দ্ধনা-সভা কয়েক জনের সজ্ঘবদ্ধ গণ্ডগোলে "ভণ্ডুল" হইয়া যাইবার পর লিখিত।

তার ওপর ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক্ মিথ্যে। তার পরে আমার বিত্তেসিত্তে কিছু নেই। বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাই নি। এমন' দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছু দিনের জন্যে জ্বর ক'রে দাও তাহ'লে দু-বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস ক'রেই দিন কাটবে। অবশ্য বেশী দিনের জন্যে এ অবস্থা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে যা কিছু ছিল সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট ক'রে দিয়ে স্বর্গগত হন।···তার পরে পড়তে স্রুরু করি। ১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধ'রে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারি নি কেবল সেই রাগে। বর্ম্মাব রেঙ্গুনে ছিলাম কেরাণী—হঠাৎ বড় সাহেবের সঙ্গে মারামারি ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেছি। কিন্তু অকস্মাৎ এমনি কপাল ফিরে গেল যে রাতারাতিই একটা বিখ্যাত লোক হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীব চেলা হয়েও দিন কাটাতে ছাড়ি নি। আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, কেবল ছোট কাজ কখনো করি নি। যখন মরব—ফর্সা খাতা রেখে যাবো—যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গাও থাকবে না।

বাজে শিবপুর। হাওড়া।

৯ই আগষ্ট '২০

পরম কল্যাণীয়াসু,——···আমার মানসিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহু দিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহু দিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন

হয়ত ইহা বুঝিতেও পারিবে যে জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।···

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে, তাহার এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্য্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত, থাক্ না। কি সেখানে আছে নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?···

দুঃখের ব্যাপারে আমিই সকলকে ছাড়াইয়া চলিয়াছি, আর সবাই আমার পিছনে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আসিতেছে—এ ধারণা সত্যও নয়, সাধুও নয়। সৌভাগ্যের দম্ভে রাবণকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের অহঙ্কারে গৌতমীকে যখন সমস্ত অর্জ্জিত পুণ্যের

জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তখন সে বিচার ইংরাজ হাকিমের আদালতেও হয় নাই, কালা-গোরার মকদ্দমায় পিনাল কোডের ধারাতেও নিষ্পত্তি হয় নাই। বই আমি যাই লিখি না কেন, এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট নাই। ('পূর্বাশা', শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৪৪)

* * *

[সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

বাজে শিবপুর। হাবড়া

২৮. ৪. ২৫

…শরীরটা তেমন সুস্থ নয়।

ভেলু বেঁচে নেই। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পৌঁছাই। তখনি বেলগেছে হাঁসপাতাল থেকে তাকে মোটরে ক'রে বাড়ী আনি। এসেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন acute gastritis. সাত দিন সাত রাত খাই নি ঘুমুই নি—তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর ক'রে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চাম্‌চে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রেও ওষুধ তার পেটে গেল না; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কাম্‌ড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার

গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না! ভোরবেলায় সে কান্না তার থাম্‌লো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কাম্‌ড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হ'তে লাগ্‌লো—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা! তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্ব্বে এত ব্যথা আমি আর পাই নি।

…ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধু বান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করতে। অর্থাৎ পাগ্‌লা কুকুর কামড়ানোর পরে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চল্‌বে। ২৮টা injectionএর আজ ১০টা injection হয়ে গেল। আরো ১৮টা বাকি। তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচতেই হবে, কারণ, Your life is too valuable! দেখাই যাক্ valuable lifeএর শেষটা কি দাঁড়ায়! তোমার শরৎ ('কালি-কলম,' ভাদ্র ১৩৩৫)

*　　*　　*

[?]

বাজে শিবপুর। হাবড়া

২৯. ৬. ২৫

মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। শরীর আমার বেশ ভালই আছে। কোন অসুখ বিসুখ নেই, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। হরিদাস তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে।

হরিদাস আমার ছোট ভাইয়ের মত। আমার মত সেও তোমাকে দেখবে। তাকে সকল কথা জানিয়ো। অমন ভাল ছেলে কাশীতে আর নেই। তা' ছাড়া সে নিজে চিকিৎসক।

প্রভাসের বৃন্দাবন থেকে শীঘ্র আসার কথা আছে, সে এসে পড়লে আমি কাশীতে একবার যেতে পারি।

প্রকাশের বিয়ে হয়ে গেছে, দিদি এখন এখানেই আছেন।

তুমি বাসা বদল ক'রে ভালই করেছ। এ ঘর কি তোমার পছন্দ-মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে ত, হয়ত ২৲ টাকা ভাড়া বেশী দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। তোমার বাড়ীভাড়ার জন্যে চিন্তা করার আবশ্যক নেই, কারণ সে টাকা হরিদাস দেবে। তোমার কাছে তারা বাড়ীভাড়া চাইবেও না।

তুমি আমাকে মাঝে মাঝে তোমার খবর দিয়ো, তোমার সকল কথা আমি হরিদাসের কাছেই শুনতে পাবো।

আমার সেই ভোলা চাকরটির বড় অসুখ। চিকিৎসা চলছে, অল্প বয়স, তাই আশা হয় সে সেরে উঠবে। তোমার শরৎ[১]

* * *

---

১ শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী লিখিয়াছেন:—"বুড়ীমা সম্বন্ধে দাদা একবার লিখিয়াছিলেন—'বুড়ীমা দুঃখে প'ড়ে একদিন আমায় ছেলে বলেছিলেন—এখন কাশীতে আছেন...ঠিকানায় খোঁজ নিও। বুড়ীমা সম্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন। বালবিধবা। বেশ পড়াশুনা ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনেক গল্প করিতেন। খুব মালপো তৈরি করিতে পারিতেন ও খাওয়াইতেন। শেষ বয়সে চোখটা খারাপ হইয়াছিল বলিয়া পড়িতে পারিতেন না।'—শরৎ চন্দ্র আমার হাত দিয়া তাঁকে কিছু সাহায্য করিতেন।...

[শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত]

শিবপুর হাওড়া

[১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬]

পরম কল্যাণবরেষু

কাল বাড়ী থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। আমার অভ্যাসের দোষে বহু দিন তোমাকে পত্র দিতে পারি নি। জানি অন্যায় যে কত বেশী হচ্ছে, তবু হয়ে ওঠে নি, এমনি কুঁড়েমি আমার। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে তোমরা ছোট ভাইয়ের মত, দাদার অপরাধ নেবে না।

আমার যথাপূর্ব্বং। যদি না ঢের বেশী বেড়ে গিয়ে থাকে। Constipation আমাকে নিয়ে তবে যাবে এইটেই অবশেষে স্থির হয়েছে—যাক্, একটা কিছু এত দিনে বোঝা গেছে। অথচ দেশে গিয়ে জলবায়ুর গুণেই হোক বা কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করি ব'লেই হোক—এ রোগটা ঢের কমে থাকে। অতএব, শেষ চেষ্টার জন্য সপরিবারে শিবপুর ছেড়ে রূপনারায়ণ নদের তীরেই বছর খানেক বাস ক'রব ঠিক করেছি। খুব সম্ভব, এই ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই সকলে চলে যাবো।…

তুমি কেমন আছ হরিদাস? সব ভাল ত? কেদারবাবু শুনেছি

চিঠিখানি ছাপানর উদ্দেশ্য—কি ভাবে নিজেকে গোপন রাখিয়া তিনি সাহায্য দান করিতেন, তার একটা প্রমাণ এর মধ্যে আছে। চিঠিতে লিখিতেছেন বাড়ীভাড়া যা কিছু হরিদাস দিবে, উহা আত্মগোপনের প্রকার মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে টাকা তিনি আমার কাছে পাঠাইতেন আমি বুড়োমাকে দিতাম।" ('সাহানা,' ১৩৪৬)

আমার সম্বাদের জন্য ব্যস্ত। বাস্তবিক আমাকে তিনি কি চোখেই যে দেখেছিলেন! কিন্তু ভুল করেছিলেন—আমি তার যোগ্য নই।

কিছু দিন থেকে শিবপুরে আর প্রায়ই থাকি না, মন ভাল লাগে না। কোথায় যে লাগবে তাও ছাই ভেবে পাই নে। দেখি এবার বাড়ী গিয়ে গোলাপের আর জুঁই মল্লিকের চাষ করে।

যাবার সময়ে বুড়ো বয়সে ওদিকের পথটা ভগবান কি বন্ধুর করেই রেখেছেন। আত্মীয় বন্ধুজনদের আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—যৌবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইহকালের মিয়াদ ফুরোয়। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩৩২।—দাদা

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩
সামতা-বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

হরিদাস, তোমার দুখানি চিঠিই আমি পেয়েছি। তোমার দেওয়া ওষুধও অনেক বিলম্বে ভাঙা-চোরা অবস্থায় আসে, দিন দুই ব্যবহারও করি কিন্তু মনে হ'ল লোকে ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছে, তাই আর খেলাম না। ওষুধ পাই নি, পেলাম শুধু তোমার সত্যকার শ্রদ্ধা এবং স্নেহ। এখন অনেকটা ভাল আছি। কিন্তু মানসিক অশান্তি না হোক্, অস্থিরতার আর সীমা নেই। এখন কেবলি অনুশোচনা হয় সেই আমার বর্ম্মার ছোট্ট চাকরিটুকুর জন্যে। মনে হয়, এ জীবনে ঐ চাকরি ছাড়া আর যদি কিছুই না করতাম!

দেনা-পাওনা যদি তুমি অনুবাদ কর ত তোমার ইচ্ছে এবং বুদ্ধি মতই ক'রো। বাঙ্‌লার হিন্দী অনুবাদ হওয়াই এক বিড়ম্বনা, তার পরে অক্ষর অক্ষর ছত্র ছত্র translate করবার ব্যর্থ চেষ্টায় যদি ভাবটুকুও যায় ত বাস্তবিকই খুব দুঃখের কথা। তবে এ দুঃখ থেকে বাঁচবার পথ নেই যখনই আমি হিন্দীতে অনুবাদ করার অনুমতি দিয়েছি।

তুমি বাঙ্‌লা ত খুব ভালই বোঝ, কিন্তু হিন্দী জানো কেমন? বস্তুতঃ এত বড় বইটার সমস্ত হিন্দী করার মত শক্ত ব্যাপার আমি ত ভাবতেই পারি নে। যদি এত বড় অধ্যবসায় তোমার থাকে ত মাঝে মাঝে কেদার-বাবুকে দেখিয়ো। তিনি চিন্ মুল্লুক ঘুরে এসেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে।

এবার একটু জলটল প'ড়ে ঠাণ্ডা হ'লেই কাশী যাবো। মাস ২।৩ থাক্‌বোই। তাতে প্রাণ থাকে আর যায়। কেদারবাবু কেমন আছেন। যদি সাক্ষাৎ হয় আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ো।

তোমার মন ত নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে—শান্তি স্বস্তি পাবার উপায়ও বড় হাতে নেই, এ অবস্থায় অনুবাদ করার মত অকেজো কাজে আবদ্ধ করলেও সময় কাটে। আর সংসারে কাজের মত কাজই বা কাকে বলে তাও বোঝা ভার।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো এবং আমি চিঠির উত্তর সকল সময়ে দিতে পারি বা না-পারি মাঝে মাঝে তোমার শারীরিক কুশল সম্বাদ দিয়ো। দাদা। ইতি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

তুমি অনুবাদ সুরু ক'রে দাও।

আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন রইল।

* * *

শরৎ-পরিচয়

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখিত]

সামতা বেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাবড়া। ১লা জুন '২৭

পরম কল্যাণীয়েষু, মণীন্দ্র তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু কতকটা দিচ্ছি দেব এবং কতকটা দেহের অবস্থাবশতঃ জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল।

তুমি আমার এখানে আসবে তাতে যে খুশী হব এ তুমি জানে কিন্তু তোমার কষ্ট হবে। একে ত ভয়ানক গরম, তাতে মাঠের উপ দিয়ে ঠিক দুপুরে আসা বিষম ব্যাপার। একটু জলটল পড়লে আ একদিন এসো। তা ছাড়া ৩রা থেকে ৬ই পর্য্যন্ত আমি শিবপুরে গিয়ে থাক্‌বো। একটু কাজও আছে এবং ২।১ দিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটাে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখবো।

(বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্ত্তী। আমি আবার জাট-খোল বদ্‌লে শিশিরের অভিনয়ের জন্যে তৈরি ক'রে দিয়েছি। বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয় নি। যদি হয় একদিন দেখো।)

এই সময়ের মধ্যে একদিন ছুটি ক'রে তোমার ওখানে গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা এবং পরে ব্রাহ্মণভোজন সমাধা ক'রে আসবো ভারি ইচ্ছে হয়েছে। তোমাদের বাড়ীর আন্তরিক যত্নের খাওয়াটার প্রতি আমার লোভ যে নেই তা নয়। অন্যান্য মঙ্গল, শুধু অর্শের অজুহাতে অত্যধিক রক্তপাতে কিছু কাহিল করেছে।

আশা করি তোমরা বেশ ভালই আছ। ভূপেন বাবু কেমন আছেন? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। দাদা

সামতাবেড, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ২৭. ৮. ২৭

পরম কল্যাণবরেষু,—মণীন্দ্র, তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠি পড়লে মনে হয় এখ্‌খুনি যাই, কিন্তু আমি ত ভাই সুস্থ নই, প্রায় দু হপ্তা থেকে influenzaর মত হয়ে ভারি দুর্ব্বল ক'বে রেখেছে। তা' ছাড়া বৃষ্টি বাদলে রেল ষ্টেশনের একটি মাত্র পথ যা' হয়ে আছে তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্‌কি নিয়ে চল্‌তে বেহারা আশঙ্কা করে হয়ত পা পিছলে বাঁধ থেকে একেবারে খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা যায়গাতেই এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়,—তাতেই দিব্যি খট্ খট্ ক'রে হেঁটে চলে,—পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায় নি—তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরও দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলেছি খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাবো।

তোমার বাবার সঙ্গে যে কত কাল দেখা হয় নি মনেও করতে পারি নে। অথচ, তাঁর মিষ্টি স্বভাবটুকুর জন্যে তাঁর প্রতি আমার কতই না শ্রদ্ধা। তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো। একটু জোর পেলেই গিয়ে একবার দেখে আসবো।

ষোড়শী অভিনয় আমি একবার মাত্র দেখেছি, এবং তারই জের চল্‌ছে। জলে ভিজে, কাদায় হেঁটে এই influenza, তুমি পারো ত একবার গিয়ে দেখে এসো। বাস্তবিকই শিশির এবং চারুব (জীবানন্দ—ষোড়শী) অভিনয় দেখবাব মত বস্তু।

আমাব আশীর্ব্বাদ জেনো! দাদা।

* * *

[শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লিখিত]

সামতাবেড়, পানিত্রাস।
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

ভূপেন, কিছু দিন পূর্ব্বে তোমাব চিঠি পেয়েছি কিন্তু তার পরেই আমাকে কুমিল্লায় যেতে হয়, এবং ফিরে এসেই বাড়ী যাই, এই জন্যে জবাব দিতে দেরি হয়ে গেলো। কিছু মনে ক'রো না। কবে যে তোমরা মুক্তি পাবে এবং কবে যে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এ কথা এই নির্জ্জন পল্লী-ভবনে ব'সে প্রায়ই ভাবি। সাহিত্য নিয়েই তোমাদের সঙ্গে পরিচয়, এবং নিজের দেশকে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসো এই জানি, কিন্তু কোন্ অপরাধে যে আবদ্ধ হয়ে আছো ভেবে পাই নে। প্রার্থনা করি যেন অচিরে মুক্তি পেয়ে আবার কর্ম্মের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে ফিরে আসতে পারো।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটা যে তোমার এতখানি ভালো লেগেছে এতে ভারি আনন্দ পেলাম। এর ভেতর সামাজিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা আছে, কিন্তু সমাধানেব ভার তোমাদের হাতে। ভবিষ্যতের এই

সুকঠিন দায়িত্বের সম্ভাবনাই হয়ত তোমাদের এত বড আনন্দ দিয়েছে। অথচ, আমার ধারণা এ বই বহু লোককেই নিরাশ করবে, তারা কোন আনন্দই পাবে না। একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পডতে হয়, হুহু ক'রে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্দ্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভালো লাগবার কথা নয়। তবুও লিখেছিলাম এই ভেবে যে কেউ-কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে। সকল প্রকার রস সকলের জন্য নয়। অধিকারী ভেদটা আমি মানি।

আরও একটা কথা মনে ছিলো সে অতি-আধুনিক-সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগতপ্রায়, তবু, ভাবী-কালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙ্‌রা না ক'রেও অতি-আধুনিক-সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড কাজ। এর পরে তোমরাও যখন লিখবে তোমাদেরও অনেক পডতে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শুধু চিত্ত-বিনোদনের হাল্কা ভারটুকু বয়ে দিয়েই অব্যাহতি পাবে না।

জেলের মধ্যে আছো, হাতে সময় অপরিসীম, এ বৃথা যেন নষ্ট ক'রো না এই তোমার প্রতি আমার আদেশ। এই নির্জ্জন বাস পরবর্ত্তী কালে যেন তোমার কল্যাণের দ্বার মুক্ত ক'রে দিতে পারে। বহুর সাহচর্য্যে বহু মানবকে যেন চিন্‌তে পারো। মানুষের স্বরূপের জ্ঞানটাই সাহিত্যের আসল মালমশলা। এই সত্যটি কোনদিন ভুলো না।

আমার শরীর বুড়ো-বয়সে যেমন থাকা উচিত তেম্‌নিই আছে। ভালো থাকো, নির্ব্বিঘ্নে থাকো এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ '৩৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু—লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি দেশের সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমশঃ দশের উৎসুক ও উৎকণ্ঠ দৃষ্টি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বেকার উপেক্ষা অবহেলার ভাব আর নাই। অর্থাৎ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তাও মানুষে এখন উপলব্ধি করিতেছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার আসনটি কেবল মাত্র দখল করিয়া রাখিলে চলিবে না, কাজের মধ্যে দিয়া স্বকীয় মর্য্যাদা প্রতি দিন প্রমাণিত করিতে হইবে, নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে তোমার কর্ম্মশীলতা সাধারণের সৌভাগ্য ও কল্যাণ সমৃদ্ধ করিতেছে। আর কোন পন্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলা কাগজের পক্ষে শুধু ব্যর্থতা নয় বিড়ম্বনা।

তোমাকে ছেলেবেলা হইতে জানি, তোমার আদর্শ তোমার অভিজ্ঞতা কতদিন আমার কাছে আলোচনা করিয়াছ, কনিষ্ঠের মতো উপদেশ চাহিয়া লইয়াছ। জীবনের পথে সে সমুদয় তুমি বিস্মৃত না হও এই ইচ্ছা করি।

কাগজ পরিচালনার কাজ কেবলমাত্র দায়িত্বপূর্ণই নয়, নানা ভাবে বিঘ্নসঙ্কুল। বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকাংশই সাময়িক নিঃসন্দেহ, তথাপি সংযম ও সহিষ্ণুতার অত্যন্ত প্রয়োজন।

জানি নির্ভীক আলোচনা সাপ্তাহিকের প্রাণ, কর্ত্তব্যবিমুখতা অপরাধ, তবু বলি তার চেয়েও মহার্ঘ তোমার আপন চরিত্র ও মর্য্যাদা। অসৌজন্য ও কুকথায় তোমার মুখের বক্তব্য যেন কোন দিন কলুষিত না হয়। কাহাকেও ছোট করার জন্য নয়, বড় করার উদ্যমেই তোমার প্রবুদ্ধ শক্তি অনুক্ষণ নিয়োজিত থাক এই প্রার্থনা করি। প্রগতির পথে জয় তোমার অপ্রতিহত হইবেই। ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩৪২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

*　　　　*　　　　*

[শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে লিখিত]

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা

২৮শে বৈশাখ ১৩৪৪।

কল্যাণীয়েষ—বুদ্ধদেব, কই আমার চিঠি লেখার কাগজ ত আজো এলো না। সবাই ভুলে গেছে বোধ হয়। আবার প্রচণ্ড জ্বর সুরু হয়েছিল। এবার রক্ত পরীক্ষায়-যদিও কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু ওঁরা স্থির করেছেন এ বস্তু ম্যালোয়ারি ছাড়া আর কিছু নয়।···যাক্ গে রোগের কাহিনী। একটা কথা। আজকাল বড় লোকদের ঘরে মেয়ের নাম প্রায়ই দেখি অঞ্জলি রাখা হয়। কিন্তু সবাই দেন দীর্ঘ ঈ। অঞ্জলিকে অঞ্জলী লিখলে কি স্ত্রীলিঙ্গ হ'তে পারে বুদ্ধদেব? কেউ কেউ বলে বাঙলায় পারে। কি জানি। সময় মতো একবার এসো। আশীর্ব্বাদ রইলো। দাদা।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

৮৫৫-৭১ (?) : মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ; আদি নিবাস—কাঁচরা-পাড়ার নিকটবর্তী মামুদপুর। দেবানন্দপুর গ্রামে মাতার নিকট অবস্থিতি ও এনট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যাভ্যাস, চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সে বিবাহ, পাত্রী—ভাগলপুর-বাঙ্গালিটোলা-নিবাসী কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনী দেবী।

৮৭৩ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া মতিলালের ভাগলপুর এইচ. ই. স্কুল হইতে তৃতীয় বিভাগে এনট্রান্স পাস।

৮৭৬ : মতিলালের মাতুলালয়—দেবানন্দপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্রের জন্ম (১৫ সেপ্টেম্বর, ৩১ ভাদ্র ১২৮৩)।

৮৭৭-৮৩ : দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন ; পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস, ডাক-নাম—"ন্যাড়া"।

৮৮৪ পিতার সহিত তাঁহার কর্মস্থল ডিহ্‌রীতে গমন।

৮৮৬ ভাগলপুরে মাতুলালয়ে আগমন।

৮৮৭ ভাগলপুরে দুর্গাচরণ এম্‌-ই-স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস।

৮৮৮ ভাগলপুর জিলা-স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে যোগদান।

৮৮৯ পুনরায় দেবানন্দপুরে আগমন ও বিদ্যাভ্যাস।

৮৯২ : মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাটপাড়ায় মৃত্যু (১ জানুয়ারি)।

৮৯৩ : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

—সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত।

৮৯৪ : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালে ভাগলপুরে গমন ও

টি এন. জুবিলী স্কুলে প্রবেশ। সেখান হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া (ডিসেম্বর) দ্বিতীয় বিভাগে পাস।

—ভাগলপুরে সাহিত্যসভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব।

—মজঃফরপুরের প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সহিত বন্ধুত্বের সূত্রপাত; সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বের পরম উৎসাহদাতা।

৯৫ : টি. এন জুবিলী কলেজে এফ-এ ক্লাসে যোগদান।

—মাতৃবিয়োগ (নবেম্বর)।

৯৬ : কলেজের পড়াশুনায় ইস্তফা। মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া পিতার সহিত ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় বাস। দেনার দায়ে দেবানন্দপুরের বসতবাটী হস্তান্তর।

৯৬-৯৯ : খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা। অভিনয়াদি দ্বারা আদমপুর ক্লাবের নাট্য-বিভাগের সুনাম বর্ধন।

—গোড্ডায় রাজ-বানলী এস্টেটে চাকুরি।

১০০ : প্রতিবেশী শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বা "পুঁটু"র (নিরুপমা দেবীর জ্যেষ্ঠ সহোদর) বসিবার ঘরে সকাল দুপুর সন্ধ্যা—সকল সময়ে একাগ্রচিত্তে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যচর্চা। এইখানেই কথা-সাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (তখন টি. এন. জুবিলী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র ও বিভূতিভূষণের সহপাঠী) সহিত প্রথম পরিচয়। 'কোরেল' (শেষাংশ), 'পাষাণ,' 'বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ' রচনা।

০১ : সাহিত্যসভার মুখপত্র—হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'ছায়া'।

—অভিমানে নিরুদ্দেশ; সন্ন্যাসী-বেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ।

১৯০২ : নাগা সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িয়া মজঃফরপুরে আগমন। শ্রীঅনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথি।

—স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর নিকট গায়ক ও বাদক হিসাবে অবস্থিতি।

—পিতার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে ত্বরায় ভাগলপুর গমন। শ্রাদ্ধাদি-শেষে "বোম্ মামা" লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলিকাতা ভবানীপুরের বাসায় আগমন।

১৯০৩ : ভাগ্যান্বেষণে বর্মা যাত্রা (জানুয়ারি) ও রেঙ্গুনে মেসোমশায়—উকীল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থিতি।

—বর্মা-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রেরিত "মন্দির" গল্প কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকে প্রকাশ।

১৯০৫ : মেসোমশায়ের মৃত্যু (৩০ জানুয়ারি)।

—পিগুতে ও পরে রেঙ্গুনে ডি. এ. জি-র আপিসে কেরানীগিরি।

১৯০৭ : 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪) ছেলেবেলার রচনা "বড়দিদি" উপন্যাস,—মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্বনামাঙ্কিত প্রথম রচনা।

১৯১২ : অল্প দিনের জন্য রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আগমন (অক্টোবর-ডিসেম্বর)। 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সহিত পরিচয়। মাতুল—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় 'যমুনা'য় নিয়মিত রচনা দানে স্বীকৃত।

১৯১৩ : 'যমুনা'য় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯) "রামের সুমতি" গল্প প্রকাশ,

মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পরিণত বয়সের প্রথম রচনা ; বয়স ৩৬।—'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুস্তকাকারে 'বড়দিদি' প্রকাশ, মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।

—'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় (পৌষ-মাঘ ১৩২০) মুদ্রিত প্রথম রচনা— "বিরাজ বৌ" গল্প।

১৯১৪ : 'যমুনা'র অন্যতর সম্পাদক (জুন)।

—অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় আগমন (ডিসেম্বর)।

১৯১৫ : 'যমুনা'র সম্পর্ক ত্যাগ , 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখক।

১৯১৬ : রেঙ্গুন জুবিলী-হলে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনায় ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেন-পঠিত (৮ মে) অভিনন্দন-পত্র রচনা।

—স্বাস্থ্যহানির জন্য এক বৎসরের ছুটি লইয়া বর্মা ত্যাগ (মে)।

—বাজে শিবপুরে অবস্থিতি।

১৯১৯ : 'বসুমতী' কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশ আরম্ভ (অক্টোবর)।

১৯২১ : কংগ্রেসের কর্মে যোগদান।

১৯২২ : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে কে. সি. সেন ও থিয়োডোসিয়া টম্‌সন্ কর্তৃক ১ম পর্ব 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।

১৯২৩ : কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' লাভ।

১৯২৪ : শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র 'রূপ ও রঙ্গ' সম্পাদন (৪ অক্টোবর)।

১৯২৫ : সরস্বতীপূজার দিন কাশী বিশ্বনাথ লাইব্রেরির ৯ম বার্ষিক সারস্বত সম্মিলনে সভাপতিত্ব (২৯ জানুয়ারি)।

—ঢাকা মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব (১০-১১ এপ্রিল)।

—হাওড়া, পানিত্রাস গ্রামে বড় দিদি অনিলা দেবীর বাটীর সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ।

১৯২৬ : সুরমা উপত্যকা ছাত্র-সম্মিলনের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে (আষাঢ়) সভাপতিত্ব ; শিলচরের ছাত্রসঙ্ঘের নিকট হইতে মানপত্র লাভ।

১৯২৭ : শিবপুর-সাহিত্য-সংসদের উদ্যোগে সম্বর্দ্ধনা ; সভাপতি—বিজয়-চন্দ্র মজুমদার (১৩ ফেব্রুয়ারি)।

—১ম পর্ব 'শ্রীকান্তে'র ইতালীয় অনুবাদ পাঠে মনস্বী রমঁ্যা রলাঁ কর্তৃক "পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর"র ঔপন্যাসিকের সম্মান দান।

১৯২৮ : ১৩৩৫, ৩১এ ভাদ্র ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে দেশবাসীর সম্বর্ধনা (সেপ্টেম্বর)।

১৯২৯ : মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (১৫ ফেব্রুয়ারি)।

—রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (৩০ মার্চ)।

১৯৩১ : রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র রচনা ও সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিত্ব (ডিসেম্বর)।

১৯৩২ : টাউন-হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন (১৮ সেপ্টেম্বর)।

১৯৩৪ : ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতি (২৭ জানুয়ারি)।

—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "বিশিষ্ট সদস্য" (জুলাই)।

—কলিকাতা অশ্বিনী দত্ত রোডে নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ।

১৯৩৬ : সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে টাউন-হলে উদ্বোধন-বক্তৃতা (১৫ জুলাই) ও আলবার্ট-হলে সভাপতিত্ব।

—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডি. লিট্" উপাধি লাভ।

—ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজে সভাপতিত্ব (৩১ জুলাই)।

—৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত (১৫ আশ্বিন)।

কলিকাতা পার্ক নার্সিং হোমে, ৬২ বৎসর বয়সে, মৃত্যু (১৬ জানুয়ারি, ২ মাঘ ১৩৪৪)।